জরাসন্ধ

# লৌহকপাট

( দ্বিতীয় পর্ব )

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-১৩
প্রচ্ছদপট শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২/১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
বাঁধাই—বেংগল বাইন্ডার্স

তিন টাকা

## উৎসর্গ

লৌহকপাটের অন্তরালে যারা শেষ নিঃশ্বাস রেখে গেল,

সেই সব বিস্মৃত মানুষের উদ্দেশে

## ॥ এক ॥

কাঁচা আর পাকার মধ্যে যে ব্যবধান, সেটা কালগত। কাল পূর্ণ হ'লেই কাঁচা লংকায় পাক ধরে, কাঁচা মাথা পাকা চুলে ভরে যায়। সংসারে একটি বস্তু আছে যার বেলায় এ নিয়ম চলে না। তার নাম চাকরি। সেখানেও কাঁচা পাকে; কিন্তু কালধর্মে নয়, তৈলধর্মে। সরকারী, আধা-সরকারী কিংবা সওদাগরী আফিসে গিয়ে দেখুন, পক্ক-কেশ সিনিয়র যখন কাঁচা রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছেন, তৈল-সম্পদে বলীয়ান কোনো ভাগ্যবান জুনিয়র তখন অনায়াসে পাড়ি দিয়েছেন কন্‌ফার্মেশনের পাকা সড়ক। গিরীনদা বলতেন, চাকরি হচ্ছে পাশার ঘুঁটি। পাকবে কি পচবে, নির্ভর করছে তোমার চালের উপর। মূল্যবান কথা। চাল অবশ্যই চাই। কিন্তু তার সংগে চাই প্রচুর তেল।

আমার সহ-কর্মী রামজীবনবাবু তৈল-প্রয়োগে অপটু ছিলেন; অক্ষ-ক্রীড়াতেও দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। তাই কালপ্রভাবে তার গুম্ফদেশে শ্বেতবর্ণের আভা দেখা দিল কিন্তু চাকরির কৃষ্ণত্ব ঘুচল না। সেজন্যে রাম-জীবনের নিজের কোনো ক্ষোভ ছিল না। কোনো অভিযোগও কোনোদিন করতে শুনিনি কর্তৃপক্ষের নামে।

'ওরা কি করবে ?'—কর্তাদের পক্ষ টেনেই বরং বলতেন রামজীবন; 'জায়গা কোথায় ? যক্ষের মত যারা ঘাঁটি আগলে বসে আছেন, তাঁরা দয়া করে সরবেন, তবে তো ? জেল-সার্ভিসে পেনসন্‌ অতি বিরল ঘটনা। পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির দুর্ঘটনা বরং শুনতে পাবে দু একটা; কিন্তু পঞ্চান্ন-প্রাপ্তির কোনো বালাই নেই, অন্ততঃ পঁয়ষট্টি পেরোবার আগে। কালে ভদ্রে দু-একটা পোস্ট যদি বা পাওয়া গেল, আগে বাবাজীবন, তবে তো রামজীবন।'

বললাম, বাবাজীবনটি কে ?

—বাবাজীবন কি একটি, যে তোমায় বলবো, কে ... ত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, এখনো ওঁদের বেশ ক'জন বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছেন।—বলে ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

পাশের ঘরটি জেলর সাহেবের। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, তিনি চোখ বুজে বৈকালিক আফিসের দৈনন্দিন তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছেন। চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর খাস মেট কলিমদ্দি গাজী নিত্যকার বরাদ্দ মত তাঁর কেশবিরল উত্তমাঙ্গে অঙ্গুলি চালনা করছে। টেবিলের তলায় বসে হারাধন পাহারা নিপুণ-হাতে পদ-সেবায় নিযুক্ত। জেলর সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম। বার্ধক্যের বলিরেখাগুলো যেন বড় স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। তার সঙ্গে স্পষ্টতর ভাবে নজরে পড়ল ওঁর গিলে করা ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, বহু যত্নে কোঁচানো দামী শান্তিপুরী ধুতি, আর আরশির মত পালিশ-ওয়ালা আধুনিক ডিজাইনের নিউকাট্‌। বাবাজীবনই বটে!

রামবাবুর দিকে ফিরে বললাম, আপনার নামকরণের তারিফ না করে পারছিনে।

রামজীবন একটু সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নামকরণের আসল মানেটা ধরতে পারছ তো ?

এবার আমারও সন্দেহ হ'ল, কথাটার হয়তো কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে, যা আমার জানা নেই।

বললাম, আসল মানেটা কি রকম ?

রামজীবন হেসে ফেললেন, এঃ! তুমি দেখছি একেবারেই আনাড়ি। ঐ যে সিংহাসনটা ওঁরা দখল করে আছেন, ওটা এক পুরুষের নয়। বেশীর ভাগই পৈতৃক, কারো কারো বা শ্বাশুরিক। ওঁরা ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার মত রাত জেগে জেগে একগাদা পরীক্ষাও পাস করতে হয়নি, আমার মত আফিসে আফিসে ধর্ণা দিয়ে চাপরাশীর গলা-ধাক্কা খেতে হয়নি। Application নেই, Interview নেই, Testimonial সংগ্রহের জন্যে হাঁটাহাঁটি নেই, চাকরি এল সোজা, সরল, সংক্ষিপ্ত পথ ধরে, অর্থাৎ Give him a chair and a table.

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, সেটা আবার কি পদার্থ ? রামজীবন কি একটা ফাইল ঘাঁটছিলেন। বন্ধ করে সিগারেট ধরালেন। তারপর পা তুলে গুছিয়ে

বসে বললেন, নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। শোনো তাহলে। একেবারে গোড়া থেকেই বলি। মিডলটন্ সাহেবের নাম শুনেছ তো?

—আই. জি. ছিলেন এককালে?

—আই. জি. ছিলেন মানে? আই. জি. তো এখনো আছে, পরেও থাকবে। কিন্তু এ একেবারে আলাদা চীজ। ডাকসাইটে ইনস্পেক্টর জেনারেল লেপ্টনান্ট্ কর্নেল মিডলটন্। খাস সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল। কথা বললে মনে হবে মেঘ ডাকছে। ভেতরে ভেতরে আবার তেমনি আত্মভোলা আশুতোষ। যত বড় অপরাধই কর, একবার গিয়ে পড়তে পারলেই হ'ল। প্রথমটা গঁ গঁ করে উঠবে। তারপরেই জল। সেবার অক্ষয় পাঠকের চাকরি গেল। রসদ-গুদামের ইন্চার্জ। সব মাল ঘাটতি। দু চার দশ সের নয়, কয়েক মণ। স্পেসাল অডিট্ বসল। কড়া রিপোর্ট। পুলিসে দেবার মত কেস। শেষ পর্যন্ত হাতকড়াটা আর পড়ল না; যা কিছু গেল চাকরির উপর দিয়ে। অক্ষয় বাবু দেখলাম কিছুমাত্র ঘাবড়ায়নি। ডিস্মিসাল অর্ডারটা পকেটে করে চলে গেল কোলকাতায়। তখনকার দিনে রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনের দিকে যারা বসতেন, তাদের পর্দানসিন জেনানা করে রাখা হয়নি। পুলিস-পাঁচিলের আড়ালে বসে ইজ্জৎ রক্ষা করতে তাঁদের বোধহয় ইজ্জতে বাধত। শুধু মহাজন নয়, অভাজনরাও বিনা-বাধায় যেতে পারত দক্ষিণের বারান্দায়। বেলা তখন দুটো, আড়াইটে হবে। আই. জি. প্রিজন্সের আফিসের সামনে তুমুল গণ্ডগোল। সাহেব কাজ-টাজ ফেলে বেরিয়ে এসে দেখেন প্রলয় কাণ্ড। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে অক্ষয় পাঠক। পেছনে ঘোমটা মাথায় একটি মহিলা, আর তার পেছনে লাইন ধরে বারোটা ছেলে মেয়ে। এমন কাঁউ মাঁউ জুড়ে দিয়েছে, কার কথা কে শোনে! মিডলটন্ গর্জে উঠলেন, Who you? কে টুমি?

—আই অ্যাম্ অক্ষয় পাঠক, স্যার।

—ড্যাম্! এটা কৌন্ প্রসেশন আছে?

অক্ষয় অত্যন্ত সহজভাবে জানাল, প্রসেশন নয়, সাহেব। এটি তোমার বৌমা, আর এগুলো তারই কাচ্চা-বাচ্চা।

—গুড্ গড্।—চোখ কপালে তুল্লেন মিডলটন্। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, এখানে কী চাই?

—চাই আর কি, সাহেব? চাকরি যখন নিয়েছ, এগুলোও নাও। এই

রাবনের গুষ্টি আমি খাওয়াবো কি দিয়ে ?

পরে শুনেছিলাম, গোষ্ঠীবর্গ সবটা অক্ষয়ের নয়। পাঁচটি ওর নিজের আর বাকীগুলো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থেকে ধার।

বললাম, আমি মনে করেছিলাম, রাস্তা থেকে। যাক্। তারপর প্রসেশনের কি গতি হ'ল ?

রামজীবন হেসে বললেন, সে তো বুঝতেই পাচ্ছ। পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন রায়সাহেব বিধু ঘোষ। জরুরী তলব পেয়ে ছুটে এলেন। আসা মাত্র, ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে অর্ডার দিলেন মিডলটন্, পাঠকটাকে কাজে বহাল করে নাও, রায়সাহেব।

পি. এ. অবাক, বলেন কি স্যর ! অর্ডার বেরিয়ে গ্যাছে। তাছাড়া চার্জ অত্যন্ত সিরিয়স্।

সাহেব বললেন, But don't you think this is more serious !—বলে আঙুল তুললেন পাঁচটি ছেলে আর সাতটি মেয়ের দিকে। অক্ষয়বাবুর উপর একটি অগ্নিদৃষ্টি ছেড়ে বললেন, বাচ্চাডের কী খাইটে ডিয়াছ ?

অক্ষয় নিরুত্তর।

—স্কাউন্ড্রেল !—বলে দুপা এগিয়ে গেলেন মিডলটন্। পকেট থেকে বেরোল মনিব্যাগ্। "বৌমার" হাতে দুখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, উহাডের সন্ডেস খাইটে ডেবেন। তারপর আবার সেই অগ্নিদৃষ্টি পাঠকের মুখের উপর এবং সেই সঙ্গে এক মেঘগর্জন—আর চুরি করিও না। যাও।

অক্ষয়বাবুব প্রসেশন চলে গেল। খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইলেন মিডলটন্। তারপর অনেকটা যেন অনুনয়েব সুরে বললেন পি. এ. কে, Give him a cheap station, Rai Saheb.

গজেনবাবু মাধ্যাহ্নিক ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। টুপিটা নেবার জন্যে আফিসে ঢুকে বললেন, খুব তো জমিয়েছেন দুজনে। খবর জানেন তো ?

বললাম, কি খবর ?

—আই. জি'র ইনস্পেকশন সাতাশ তারিখে। সাহেবের কাছে ডি. ও. এসে গ্যাছে।

গজেনবাবু বেরিয়ে যেতেই অপ্রসন্নমুখে বললাম, এ আবার এক উৎপাত শুরু হ'ল।

রামবাবু হেসে বললেন, যা বলেছ! এখন ঐ উৎপাতটাই আছে, সে উত্তাপ আর নেই।

—উত্তাপ কি রকম?

—উত্তাপ নয়? আই. জি. আসছেন! কী থ্রীল্ ছিল এই ছোট্ট কথাটার মধ্যে। সে সব তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। সকালের ডাক খুলে দেখা গেল টুর প্রোগ্রাম। ব্যস্। মুহূর্তে মধ্যে যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল গোটা জেলখানা—বড় সাহেব থেকে আরম্ভ করে মেথর-দফার গয়জন্দি ওস্তাগর। লেগে গেল সাফাই-এর ধুম। চালাও ঝাড়ু, ঢালো ফিনাইল, রাস্তায় নর্দমায়, ঘরে বারান্দায় যেখানে সেখানে লাগিয়ে যাও চুনের প্লাস্টার। মিডলটন্ সাহেবের ইনস্পেকশন! তার প্রথম এবং শেষ কথা হ'ল—সাফাই। কাজ কর্ম কদ্দুর কি করেছ তোমরা, সে খবরে তাঁর দরকার নেই। কয়েদীরা খেতে পরতে পাচ্ছে, কি পাচ্ছে না, ও-সব নিয়েও মাথাব্যথা নেই। রসদ-গুদামের কোণে, লাইন দেওয়া বস্তার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখবেন কটা আর-সোলা বসে আছে; আফিসের আলমারি আর বই-এর র‍্যাকের পেছনে লাঠি চালিয়ে দেখবেন, কোথায় লুকিয়ে আছে টিকটিকি আর কুনোব্যাঙ্। এসব মারাত্মক জানোয়ারের হাত থেকে তবু পার আছে। কিন্তু মাকড়সার দেখা পেলে আর রক্ষা নেই। আগাগোড়া সব ব্যাড্। জেলর বাবুরা তাই হপ্তা-খানেক আগে থেকেই গোটা কয়েক C. D. gang বানিয়ে ফেলতেন। কয়েদীরা আর সব কাজ কর্ম বন্ধ রেখে বাঁশের মাথায় ঝাঁটা বেঁধে দলে দলে মাকড়সা তাড়িয়ে বেড়াত।

প্রশ্ন করলাম, C. D. gangটা কি জিনিস?

—Cobwebs Destroying Gang. আমরা সংক্ষেপে বলতাম C. D. gang, মোটা রেমিশন বখশিশ পেত এদের চার্জে থাকত যে-সব মেট পাহারা। সত্যি, মাকড়সা জাতটা ভারি নেমকহারাম। আজ সন্ধ্যাবেলা বেটাদের জালটাল ছিঁড়ে গোষ্ঠীসুদ্ধ বেমালুম উচ্ছেদ করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ; কাল সকালে গিয়ে দ্যাখ, বেশ একটি সূক্ষ্ম জাল টাঙিয়ে নতুন করে সংসার পেতে বসেছে। কাজেই C. D. gang-এর কাজ চলত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আই. জি. এ ধারটা রাউন্ড দিচ্ছেন, C. D.-রা ঝাড়ুবাঁধা বাঁশ ঘাড়ে করে ছুটছে ওধারে।

রামজীবনবাবুর মত অতগুলো না হোক অপেক্ষাকৃত হাল আমলের দু-চারটা ইনস্পেকশন আমিও দেখেছিলাম। এ মহাপর্বের প্রথম অধ্যায় ছিল জেলর এবং ডেপুটি বাবুদের সোর্ড-স্যালুট। আই. জি. এসে সামনে দাঁড়াতেই, ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফেলে যাওয়া খানকয়েক মরচে-ধরা তলোয়ার নিয়ে বাবুরা যে কসরৎ দেখাতেন, যাত্রার দলের চেয়ে সেটা কম উপভোগ্য ছিল না। এই আস্ফালন আমাকেও একদিন দেখাতে হয়েছে; কিন্তু তার কৌশলটা কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারিনি। কেবলই আশঙ্কা হ'ত, "প্রেজেন্ট আর্ম্স্' দেখাতে গিয়ে আমার নাসিকার কিঞ্চিৎ অংশও বুঝি উপর-ওয়ালার পদপ্রান্তে প্রেজেন্ট দিতে হয়! অদৃষ্টের জোর ছিল। নাসিকা অক্ষত আছে। সেই মধ্যযুগের তলোয়ার খেলা আজও চলছে। বিভিন্ন জেলের প্যারেড গ্রাউন্ডে বৎসরান্তে যখন তার হাস্যকর অভিনয় দেখি এবং হুঙ্কার শুনি, মনে মনে কৌতুক বোধ করে থাকি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের রসবোধের তারিফ করতে পারি না। যাক্ সে কথা।

রামজীবনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, আপনার মিডলটন্‌কে অসি-যুদ্ধ দেখাতে হ'ত না ?

—নিশ্চয়ই হ'ত। তবে আমরা যেটা দেখাতাম, সেটা তোমাদের কালের ছেলেখেলা নয়, একেবারে খাঁটি এবং নিখুঁত সোর্ড-স্যালুট্। পুরো সাত দিন ধরে মহড়া দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। ভুলচুক হলে রক্ষা নেই। সার্ভিস-রেকর্ডে কালো কালো দাগ!

—আপনার কপালে জুটেছে নাকি দু-চারটা ?

—জোটেনি আবার ? আরে, আমি তো কোন ছার ? বড় বড় মহারথীরাও বাদ যাননি। এই যেমন ধর রায় সাহেব গনপতি সান্ন্যাল। অত বড় বাঘা জেলর। নাম শুনলে এখনো আমাদেব বুক ঢিব্ ঢিব্ করে। তাঁর কাণ্ডটা শোনো। রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে এসেছেন মিডলটন্। বড় একখানা সোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছেন রায় সাহেব। পেছনে আমরা চার জন ডেপুটি আর রিজার্ভ চীফ্ বলবন্ত সিং। আই. জি'র গাড়ি এসে থামতেই হুঙ্কার দিলেন—স্লোপ্ আর্ম্স্। খড়্গ উদ্যত হল। মিডলটন্ নেমে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে কমাণ্ড দিলেন জেলর সাহেব—'প্রেজেন্ট আর্ম্স্'। হাত টান করে নামিয়ে দিলাম তলোয়ার। ব্যস্। আর সাড়া শব্দ নেই। দু মিনিট তিন মিনিট যায়। হাত টাটিয়ে উঠল আমাদের। আড় চোখে

তাকিয়ে দেখি, থম্‌থম্‌ করছে রায় সাহেবের মুখ।

বয়স হয়েছে। একে নার্ভাসনেস্‌, তার ওপরে বুকের ভেতর প্যালপিটেশনের ধাক্কা। পরের বুলিটা আর মনে আসছে না কিছুতেই। সুপার চঞ্চল হয়ে উঠেছেন! আই. জি'র মুখে অমাবস্যা। ব্যাপার গুরুতর দেখে, গলা ছাড়ল বলবন্ত সিং। কোনরকমে মুখ-রক্ষা হ'ল, আর সেই সঙ্গে আমাদেরও প্রাণ-রক্ষা। কিন্তু রায় সাহেবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অতবড় সেন্ট্রাল জেল থেকে বদলি হলেন যশোর ডিস্ট্রিক্ট জেলে।

রামজীবন সিগারেট ধরালেন। বললাম, চেয়ার টেবিলের গল্পটা তো শোনা হ'ল না।

দেশলাইএর কাঠিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এইবার শোন। ধর, ইনস্‌পেকশন ভালয় ভালয় উৎরে গেছে। মাকড়সা স্বেচ্ছাচারি করেনি। সি. ডি'দের কাজ নিখুঁত। মিডলটন্‌ খুশী হয়েছেন। খোস-মেজাজে বেরিয়ে এসেছেন গেট পার হয়ে। সুপার সাহেবের সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করে মোটরে উঠতে যাবেন; পাশ থেকে স্যালুট দিল একটি ছোকরা। পরনে লম্বা খাকী প্যান্ট্‌, তার ওপরে মিলিটারী প্যাটার্ন হাফশার্ট। দুটোর কোনটাই তার নিজস্ব নয়; সম্ভবতঃ পৈতৃক সম্পত্তি। শ্রীমানের সঙ্গে তার ছোটভাইটিকেও একসঙ্গে উদরস্থ করতে পারে। মিডলটনের মুখে কৌতুক হাসি ফুটে উঠল। জেলর সাহেবের দিকে তাকাতেই, তিনি বিনীত কণ্ঠে বললেন, My son, Sir, কিংবা My son-in-law, Sir.

—I see. Is he going to school?

—না, সাহেব। ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছি। ইংরেজি চমৎকার শিখেছে। Very eager to serve under you. দয়া করে পায়ে স্থান দিলে গরীব বেঁচে যায়। অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা।

সাহেব তাঁর বেতের লাঠিটা দিয়ে শ্রীমানের পেটে একটা খোঁচা মারলেন, বোধহয় বিদ্যার পরিমাণটা পরখ করবার জন্যে। তারপর বললেন, All right. Give him a chair and a table.

এক কথায় চাকরি হয়ে গেল। অর্থাৎ মাইনের সঙ্গে দেখা নেই। আফিসের একপাশে একটি চেয়ার ও একখানি টেবিলের ব্যবস্থা হ'ল বাবাজীবনের জন্যে। বৎসরান্তে আবার এলেন আই. জি.। এবার গেটের বাইরে নয়, ভেতরেই হাজির করা হ'ল শ্রীমানকে। পরনে নিজের সুট। পুত্র বা

জামাতার অসামান্য কৃতিত্বের লম্বা ফিরিস্তি দিলেন জেলর সাহেব। পূর্ব বন্দোবস্ত মত সুপারও যোগ করলেন দু-চার লাইন। তারপরেই উপর আবার সেই লাঠির খোঁচা। Admission Register লিখতে পার?—প্রশ্ন করলেন মিডটলন্।

—ইয়েস, স্যর।

—পয়লা অক্টোবর তিন মাস জেল হ'লে তার খালাস পড়বে কোন্ তারিখে?

নির্ভুল উত্তর পাওয়া গেল। গাড়িতে উঠতে উঠতে সুপারের দিকে ফিরে আদেশ করলেন আই. জি.—'একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন ওর কাজ সম্বন্ধে। জায়গা খালি হ'লে বিবেচনা করে দেখবো।' যথাসময়ে রিপোর্ট চলে গেল। পাঁচ সাত মাস কিংবা একবছর পরে অর্ডার এল,—'বাবু অমুক চন্দ্র অমুককে অত তারিখ হইতে অস্থায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলর পদে নিযুক্ত করা হইল।' মুরুব্বির জোর রয়েছে। অস্থায়ী স্থায়ী হতে দেরি হ'ল না। তারপর পৈতৃক বা শ্বাশুরিক আসনের দিকে টপাটপ এগিয়ে চললেন শ্রীমান। এমনি করেই চলছে। এক বাবাজীবন এগিয়ে যান, তো আর এক বাবাজীবন এসে তার শূন্য আসন দখল করেন। তাহ'লেই বোঝো, রামজীবনকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ইংরেজ কবি কাব্যলক্ষ্মীকে বলেছেন, Jealous mistress. আমি কবি নই, ইংরেজ নই। আমার কাছে সত্যিকার জেলাস মিস্ট্রেস্ যদি কেউ থাকেন, তিনি নিদ্রাদেবী। অত্যন্ত কড়া মনিব। নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করেন এবং তার উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেন না। আপনার বাৎসরিক পরীক্ষা আসন্ন। চোখের সামনে রাশি রাশি সর্ষের ফুল শোভা পাচ্ছে। আর কোনো পথ না দেখে এগারটার ঘুমকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন একটায়। মনে করলেন, খুব লাভ হ'ল। কিন্তু, হায়, পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, সেই সঙ্গে ভুলও ভাঙল আপনার। দেখলেন, ঘড়ির কাঁটা সাড়ে সাতটা ছাড়িয়ে আটটার দিকে ধাবমান। অর্থাৎ ভবী ভুলবার নয়। রাত্রির অবহেলার শোধ নিয়েছে রাত্রি-শেষে।

আমার বাৎসরিক পরীক্ষা নেই; আছে সাপ্তাহিক নাইট-রাউণ্ড বা নৈশ চক্কর। তারি ধাঁধায় বেরিয়েছিলাম রাত দুটোয়। জেলাস মিসট্রেস্ তার

দাবি ছাড়লেন না। মুক্তি দিলেন পরদিন বেলা আটটায়। ধরাচুড়া এ'টে হন্তদন্ত হ'য়ে আফিসে যখন পোঁছলাম, জেলের চাকায় তখন পুরো দম চলছে। জেলর সাহেবের ঘরের সামনে দিয়ে পথ। শ্যেনদৃষ্টির কবলে পড়তেই কল-কণ্ঠে বিপুল অভ্যর্থনা— Good morning, মলয়বাবু। এই যে আসুন; আসতে আজ্ঞা হোক্।

গিরীনদা বলেছিলেন, চাকরি-জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন হ'ল একখানা মুখোশ। নিজের আসল মুখখানা কাউকে দেখিও না। অন্ততঃ উপরওয়ালাদের তো নয়ই। তখন হেসেছিলাম। পরে বুঝেছি, এর চেয়ে মূল্যবান উপদেশ আর হ'তে পারে না। তাই জেলর-সাহেবের আন্তরিক অভ্যর্থনায় পিত্ত যখন জ্বলে উঠল, একখানা মোলায়েম মুখোশ পরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি এক টুকরা কাগজ আর এক গোছা চাবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, রাম-জীবনবাবু আসবেন না। এই নিন তার চিঠি আর চাবি।

—কী হ'ল রামবাবুর ?

জেলরবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, কি জানি মশাই, ডাইরিয়া না ডায়া-বেটিস, কি একটা লেখা আছে ঐ চিরকুটে। আসলে, এটা হ'চ্ছে মেন্টাল শক। .......আমি অপেক্ষা ক'রে আছি দেখে মাথা নেড়ে বললেন, শোনেননি, বুঝি? এবারেও হ'ল না। সিউড়িতে চান্স পাচ্ছে ক্ষেত্তরদার ছেলে বংশী।

একটু চিন্তার ভান ক'রে বললাম, রামজীবনবাবু মনে হচ্ছে ও'র সিনিয়র।

—সিনিয়র হ'লে কি হবে ? 'কিন্তু' আছে এর মধ্যে।

একটু থেমে, আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন মশাই, আমি সিধে মানুষ। সোজা কথায় বুঝি, চাকরি করতে এসে ওসব মহত্ব টহত্ব দেখালে চলে না। এখানে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কি বলেন ?

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলাম, সে তো নিশ্চয়ই।

—তবে ? বাগান থেকে কয়েদি পালাল। সিপাই মরবে; মরুক। আমার আপনার কি এসে গেল ? সিপাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ফ্যাসাদ ডেকে আনবার দরকারটা কি ? যাক্। ওসব যার কথা সেই বুঝুক। আপনি দেখুন খালাস টালাস কি আছে। চটপট নিয়ে আসুন। সাহেব আসবার সময় হ'ল।

সেই দিনই সান্ধ্য আফিস শেষ করে গেলাম রামজীবনবাবুর বাড়ি। ঢুকেই সামনের ঘরটায় থাকেন। দেখলাম খাটের উপর বসে পাদুটো ডুবিয়ে দিয়েছেন

একবালতি জলের মধ্যে। পাশে দাঁড়িয়ে রামবৌদি মাথার উপর পাখার বাতাস করে চলেছেন। রামবৌদি কথাটা বোধহয় দ্ব্যর্থ-বোধক। রামদার স্ত্রী, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর শ্রীঅঙ্গের ইঙ্গিত।

—কি করছেন, দাদা ?

—এই যে এসো, ভাই। মাথাটা ছাড়ছে না। একটু ফুটবাথ নিচ্ছি।

—সেই সঙ্গে আবার মাথায় হাওয়া ?

—হ্যাঁ। একাধারে ডবল এ্যাক্‌শন্‌।

মহিলাটি দেখলাম গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। বললাম, পাখাটা আমাকে দিন তো, বৌদি। আপনি বরং একটু চা টা-এর যোগাড় দেখুন।

রামবৌদি পাখা নামিয়ে রেখে আঁচলে মুখ মুছে বললেন, থাক্‌, আপনাকে আর হাওয়া করতে হবে না। আর দরকারও নেই। চায়ের সঙ্গে কি খাবেন বলুন তো ? আপনার তো আবার মিষ্টি-টিষ্টি চলবে না। কাঁচা লঙ্কা কিন্তু আমার ঘরে নেই।

রামবৌদি বাঁকুড়ার মেয়ে। আমার দেশ পদ্মার ওপার। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের এই মধুর বিরোধ নতুন নয়। বললাম, তা জানি। কাঁচা লঙ্কার মর্যাদা বুঝতে আপনার অনেক দেরি। কড়াই-এর ডাল আর পোস্ত চচ্চড়ি আছে তো ? অগত্যা তাই নিয়ে আসুন।

রামজীবনদা হেসে বললেন, ওসব থাক্‌। ডবল অমলেট করে নিয়ে এসো দু ডিশ।

বৌদি কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললেন, দু ডিশ বৈকি! জ্বরের মধ্যে ডিম ভাজা! ও সব আমার দ্বারা হবে না বাপু।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি ভুল বুঝলেন, বৌদি। দাদা ওটা আমার মুখ চেয়েই বলেছেন। উনি জানেন, একখানা এলে আমার হজমের ব্যাঘাত ঘটবে।

বৌদি হেসে চলে গেলেন।

বালতির ভিতর থেকে পা তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে খাটের উপর গুটিয়ে বসলেন রামজীবনবাবু। ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, তারপর, আফিসের খবর কি, বল তো ?

মোটামুটি খবর দিলাম, এবং সেই সঙ্গে যোগ করলাম জেলর সাহেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। রামজীবনের মুখের হাসিটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। ঘরের সামনে একফালি সরু রাস্তা। তারপরেই খাল। বর্ষার তাড়নায় ফেঁপে ফুলে ভরে উঠেছে। কূল ছাপিয়ে এল বলে। কোথাও সোজা, কোথাও পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে তীব্র স্রোত। ওপার থেকে দুর্বার বেগে ধেয়ে এল বৃষ্টি। চক্ষের নিমেষে খাল পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এপারের বাড়িগুলোর উপর। চারদিকের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, জানালাটা বন্ধ করে দিই?

—না, থাক্—অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন রামজীবন। বাইরের জল-ঝড়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, একটা কথা তোমায় বলবো।—এতদিন বলি বলি করেও বলা হয়নি। দেখছিলাম, সে রাতটার সঙ্গে আজকের রাতের আশ্চর্য মিল। এমনি বর্ষাকাল। খালের জল ঘাট ছাপিয়ে উঠেছে। এমনি দুর্যোগ। তুমি যেখানে বসে আছ, তার ঠিক পেছনে ঐ মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে বৌটার কি কান্না! পাশে সেই কয়েদীটা ছবির মত দাঁড়িয়ে। কোলে মাস কয়েকের একটি ঘুমন্ত বাচ্চা। আমি এই খাটের উপর ঠিক এমনি করে বসে। ভেবে চলেছি কী করবো, কী আমার কর্তব্য। তোমার বৌদি গেছেন বাপের বাড়ি। ছেলেপিলেরাও গেছে সেই সঙ্গে। নির্জন বাড়িতে আমি একা। একটু পরামর্শ করবো, সে উপায়ও নেই। অথচ স্থির একটা কিছু করতেই হবে। দেরি করবার সময় নেই।

বৌদি নিজে আসেননি। মেয়ের হাতে পাঠিয়ে দিলেন চা এবং ডিমভাজা। দাদাকেও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু উনি তখন অন্য লোকে। অমলেটের দিকে নজর পড়ল না। ডবল বালিশের উপর পাশবালিশ; তার উপর মাথা রেখে ধীরে ধীরে বলে গেলেন সেই বর্ষারাতের অনুক্ত কাহিনী।

এই জেলেরই দু'বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন আসিনি। জেলরও ছিলেন অন্য লোক। শ্যালিকার বিয়ে উপলক্ষ্যে দিন সাতেকের ক্যাজুয়াল ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন কোলকাতায় না বর্ধমান। অ্যাকটিনি করছিলেন রাম-জীবনবাবু। মাইল দেড়েক দূরে জেলের বাগান। তার তম্বির তদারকের ভার জেলরের উপর। বৈকালিক ডিউটির একটা বড় অংশ প্রায়ই সেখানে কাটাতে হয়। তার জন্যে এলাউন্স বরাদ্দ আছে মাসিক পাঁচটাকা। যুদ্ধের বাজারে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ছ' টাকা চার আনা। এলাউন্সের লোভে না

হোক, কর্তব্যের খাতিরে রামজীবনও বাগান দেখতে যান। আঠারো কুড়ি জন কয়েদী রোজ সেখানে সকালে বিকালে কোদাল চালায়। তাদের চার্জে আছে একজন বেটনধারী সিপাই। সে একাধারে সান্ত্রী এবং কৃষি-বিদ্যা-বিশারদ। চাষবাসের খেদমত এবং কয়েদী বাহিনীর খবরদারি—এ দুটোরই ভার তার উপর।

সাতদিনের জেলর রামজীবন গেছেন বাগান পরিদর্শনে। নতুন লোক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন সব খুঁটিনাটি। সিপাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। সন্ধ্যা হয় হয়। কয়েদীদের ফিরবার সময় হয়ে গেছে। মেট তাদের এ ক্ষেত ও ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়েছে এনে পুকুরপাড়ে। গুনতি হ'ল—দু, চার, ছয়, আট...। এ কি! একটা যে কম! দ্যাখ্‌তো কোন্‌টা আসেনি—হুকুম করল পাহারাকে। পাহারা খাতার সঙ্গে নাম মিলিয়ে বলল, মেনাজদ্দিটা আসেনি। হাঁক ডাক চলল মেনাজদ্দির নাম ধরে। কোনো সাড়া নেই। এখানে সেখানে খুঁজে দেখা হ'ল। ফল একই। মেট ছুটে গেল সিপাইকে খবর দিতে। রামজীবন তখন বাগানের ফটক পার হয়ে রিকশায় উঠতে যাচ্ছেন। সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল পাশে; রিকশা চলতে উদ্যত হলেই খটাস্‌ করে বুট ঠুকে লাগিয়ে দেবে স্যালুট। এমন সময় এল সেই ভয়াবহ রিপোর্ট—মেনাজদ্দি নেই। মাথার ভিতরটা ঝিম্‌ ধরে গেল রামজীবনের। সেই সঙ্গে মনে হ'ল হৃৎপিণ্ডের কলকব্জাগুলো আর চলছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন স্থানুর মত, খেয়াল নেই। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল সিপাই-এর চিৎকার শুনে—'জেল্‌মে যাতা হ্যায়, হুজুর।' চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। জলদি যাও। অ্যালার্ম দিতে বল এখখুনি।' হঠাৎ মনে পড়ল বাকী কয়েদীগুলোর কথা। তাড়াতাড়ি বাগানে ফিরে গিয়ে তাদের চার্জ নিলেন। সিপাই ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে পথের বাঁকে। এ তো যে সে দৌড় নয়, মরণ-দৌড়। কয়েদীটা একা যায়নি, তার সঙ্গে নিয়ে গেছে এই দরিদ্র লোকটার বাকী জীবনের রুটি। দেড় মাইল পথ পার হতে লাগল দশ মিনিট। সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেটে বেজে উঠল অ্যালার্ম। রণ-রঙ্গে ধেয়ে এল লাঠি আর বন্দুকধারীর দল। তার সঙ্গে যোগ দিল পুলিসবাহিনী। বাগান আর তার আশপাশ জুড়ে শুরু হল প্রলয় নৃত্য। পলাতক কয়েদীর জন্যে জান দিল কুমড়ো কচু, ঝিঙে পটল, আর মান দিল চারদিকের কতগুলো কুটিরবাসী গৃহস্থ-পরিবার। মেয়েদের আব্রু রক্ষার ওজুহাত অগ্রাহ্য করে

তাদের রান্না আর শোবার ঘরে, আস্তাকুঁড় আর শৌচাগারে চলল খানিক বেপরোয়া পুলিসী সন্ধান। কিন্তু মেনাজদ্দির খোঁজ মিলল না।

আলার্ম শেষ হতেই সুপার এলেন। শুরু হ'ল এনকোয়ারী পর্ব। গতানুগতিক রীতি অনুসারে তিনি যখন বাগানী সিপাইকে সস্‌পেন্ড করবার হুকুম দিতে যাবেন, রামজীবন আপত্তি জানিয়ে বসলেন। দৃঢ়ভাবে বললেন, এ পলায়নের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর। সিপাই জেলরকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, কয়েদীর দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ পায়নি। তারই সদ্ব্যবহার করেছে মেনাজদ্দি। বলা বাহুল্য, সুপার এ যুক্তি মেনে নিলেন না। আইন বলছে, কয়েদীর হেফাজত যার উপর ন্যস্ত তার গতিবিধির জন্যে দায়ী হবে সেই ওয়ার্ডার। জেলরের ইনস্‌পেকশন্ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এবং শুধু সেই কারণে সিপাইকে তার আইন-নির্দিষ্ট দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না। সুপার মন্তব্য করলেন, তাঁর মতে রামজীবনের এই অহেতুক উদারতা দুর্বলতার নামান্তর মাত্র। এই রকম মনোভাব জেলর পদাধিকারী দায়িত্বশীল অফিসারের পক্ষে মারাত্মক, এবং সিপাই-বাহিনীর মধ্যে ডিসিপ্লিন রক্ষার অনুকূল নয়।

উপরওয়ালার কাছ থেকে সরব তিরস্কার এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে নীরব উপহাস সম্বল করে রামজীবন যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন অনেক রাত। আরও অনেক রাত পর্যন্ত এই বিছানায় পড়ে ঐ কথাগুলোই তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। সত্যিই কি তাই? আইনের দৃষ্টি ছাড়া মনুষের চোখে কি আর কোনো দৃষ্টি নেই? ন্যায়, অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড ঐ জেলকোড্ কিংবা পিনালকোড্? আমার মন কেউ নয়? আমার যে আইন-না-পড়া সহজ বিচার-বুদ্ধি, তার কি কিছুই বলবার নেই?

জেলগেটে একটার ঘণ্টা শুনতে পেলেন রামজীবন। তারপর কখন এক-সময়ে ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে এল তার উত্তপ্ত স্নায়ুজাল। স্বপ্নের মধ্যে মনে হ'ল, কে তাকে ডাকছে, মৃদু কোমল কণ্ঠে—বাবা। গলাটা যেন তার বড় মেয়ে কল্যাণীর মত। সাড়া দিতে যাবেন, হঠাৎ মনে পড়ল, তারা তো এখানে নেই। আবার সেই কুণ্ঠা-জড়িত কণ্ঠ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন রামজীবন, কে?

—আমরা, বাবা,—দরজার বাইরে থেকে জবাব এল।

—কে তোমরা?

—দরজাটা খুলুন না?—ভীরু কণ্ঠের কাতর অনুরোধ।

রামজীবন জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।। দরজার ওপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ, পাশে একটি স্ত্রীলোক। তার দুহাতে কাপড় জড়ানো একটা পোঁটলার মত। তার ভিতর থেকে শিশুর কান্না শোনা গেল। চেপে বৃষ্টি এল এক পশলা। রামজীবন দরজা খুলতেই ওরা তাড়াতাড়ি দাঁড়াল এসে ঘরের মধ্যে। হ্যারিকেন উস্কে দিতে দেখা গেল, লোকটার গায়ে কয়েদীর পোশাক। ভিজে সর্বাঙ্গে লেপটে গেছে। মেয়েটির পরনে যে শাড়ি তার থেকেও জল ঝরছে। রামজীবন রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমরা? কি চাই এত রাত্রে?

লোকটা জোড় হাত করে বলল, আমি মেনাজদ্দি। বাগান থেকে পালিয়েছি আজ সন্ধ্যাবেলা—

রামজীবন যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মেয়েটি বলল, ও ধরা দেবে, বাবা। ওকে জেলখানায় ফিরিয়ে নাও।

—ধরা দেবে! তা এখানে কেন? থানায় যেতে বল।

পোঁটলা শুদ্ধ বাচ্চাটা মেনাজদ্দির হাতে দিয়ে বৌটি বসে পড়ে রামবাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

কান্নার সুরে বলল, ওরা যে খুন করে ফেলবে বাবা।

খুন না হলেও অভ্যর্থনার মাত্রাটা যে তার কাছ ঘেঁসে যাবে একথা রাম-বাবুর অজানা ছিল না। জেলগেটে পাঠালেও বিশেষ তারতম্য হবে না, তাও তিনি জানতেন।

মেনাজদ্দির দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, পালিয়েছিলি কেন?

উত্তর দিল তার বৌ—সব কসুর আমার; বাপজান। আমি খবর দিয়ে-ছিলাম। বাচ্চাটা জ্বরে বেহুঁস। ডাকলে সাড়া দেয় না। বড় ডর হ'ল। সোনার মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম—শেষকালে একবার দেখতে পেল না ছেলেটাকে! আমার জ্ঞান ছিল না, বাবা। খবর পেয়েই ও যে পালিয়ে আসবে, বুঝতে পারিনি।

রামজীবন নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বৌটি একটু থেমে আবার বলল, পায়ে তোমার জুতো আছে। সাজা যা দেবার তুমি নিজে হাতে দাও। জেল খাটিয়ে নাও যতদিন ইচ্ছা। দোহাই তোমার, থানায় পাঠিও না এই রোগা মানুষটাকে।

মিনতি-সজল চোখদুটি তুলে ধরল রামজীবনের দিকে। মুখখানা একেবারে

কচি। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তায় শীর্ণ ম্লান। বোধহয় কল্যাণীর বয়সীই হবে মেয়েটা। দেখতে আরো ছোট দেখায়। ওর মুখের দিকে চেয়ে রাম-জীবনের হঠাৎ মনে এল একটা নিতান্ত অবান্তর কথা—মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এবার পাত্রস্থ করতে হবে। তারপর সে চলে যাবে পরের বাড়ি। কত দূরে কে জানে? কতদিন পরে পরে দেখতে পাবেন, তাও অনিশ্চিত। মেনাজদ্দির দিকে চেয়ে তিক্তস্বরে বললেন, ব্যাটা চুরি করেই যদি খাবি, বিয়ে করতে গিয়েছিলি কিসের জন্যে? না-না। আমি কিছু করতে পারবো না। এসব পুলিসের ব্যাপার। থানায় খবর দিতে হবে।

বৌটার কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর কিছু বোধহয় বলতে সাহস করল না। শুধু নত হয়ে আরো জোরে চেপে ধরল রামজীবনের পা দুটো। গভীর রাত্রির অন্ধকারে তারি উপর ঝরে পড়তে লাগল তার বাধাহীন চোখের জল। মেনাজদ্দি বৌকে দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ও আসবার পরে আর চুরি করিনি, বড়বাবু।

—চুরি করিসনি! জেল হ'ল খালি খালি, কেমন?—ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রামজীবন।

মেয়েটি মুখ তুলে বলল, সত্যি কথা, বাবা। এবার ও চুরি করেনি। যে রাতে চুরি হ'ল রায়বাবুদের বাড়ি, সেদিন জ্বরে ওর হুঁস ছিল না। সমস্ত রাত পাখা করে ভোর বেলা একটু ঘুমের মতন দেখে, আমিও একটু কাত হয়েছিলাম। পুলিস এসে টেনে তুলল। দারোগা সায়েবকে কত করে বললাম, শুনল না। জ্বরো মানুষটাকে বেঁধে নিয়ে গেল মারতে মারতে। তারপর শুনলাম, এক বছর জেল হয়ে গেছে।......আঁচলে চোখ মুছে বলল—......এবার ভেবেছিলাম, এ দেশে আর নয়। খালাস হ'লেই আমার ফুপার কাছে চলে যাবো। মস্ত বড় গেরস্ত। দুবেলা তার জমিতে কিষাণ খাটলেও আমাদের তিনটা পেট স্বচ্ছন্দে চলে যায়।...খোদার মরজি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার রামজীবনের পায়ে হাত রাখল মেনাজদ্দির বৌ। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মাথা তুলে প্রশ্ন করল, এবারে আবার কদ্দিন সাজা হবে, বাবা?

রামজীবন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। প্রশ্নটা তার কানে গেলেও মনে পেঁছল না। বললেন, কোথায় থাকে তোমার ফুপা?

—সে, অনেক দূরে। ভাটিতে। দুদিন দুরাত লাগে নৌকোয়।

—নৌকা ভাড়া কত ?

—তা তো জানি না, বাবা।

মেনাজদ্দি বলল, চার পাঁচ টাকা লাগে কেরায়া নৌকায়।

রামজীবন দুহাত পেছনে জড়ো করে ঘরময় পায়চারি করলেন কয়েকবার। পাশের ঘরে গেলেন। আবার ফিরে এলেন। একবার উঠে বসলেন খাটের উপর। তারপর নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন লোকটার মুখোমুখী। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সেখানে গেলে পুলিসের হাত এড়াতে পারবি। খুঁজে ধরে আনবে না ?

মেনাজদ্দির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। বলল, ভাটিতে ? পুলিসের বাবার সাধ্যি কি কাউকে খুঁজে বার করে, বড়বাবু ? চারদিকে খালি বড় বড় গাঙ্। এ পার ও পার নজর পড়ে না। তিরিশ চল্লিশ কোশ দূরে থানা। কে কার খবর রাখে ? ভাটি বড় জবর দেশ।

রামজীবন আবার পাশের ঘরে ফিরে গেলেন। নিয়ে এলেন নিজের ধুতি, কল্যাণীর একখানা শাড়ি, আর ছোট ছেলের গোটা দুই পুরানো জামা। ধুতিটা মেনাজদ্দির হাতে দিয়ে বললেন, পবে নে এটা। আর ঐ জাঙ্গিয়া-টাঙ্গিয়াগুলো ফেলে দিয়ে আয় খালের জলে।

কয়েদীটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল; যেন বুঝতে পারেনি জেলর-বাবু কি বলছেন। রামজীবন ধমকে উঠলেন, হাঁ করে দেখছিস কি ? কথা কানে যাচ্ছে না ?

কম্পিত হাতে কাপড়টা নিয়ে সে বাইরে চলে গেল। বাকী জামা কাপড় এবং সেই সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, ঐ পুলের ধারেই কেরায়া নৌকার ঘাট। দু-এক টাকা বেশী দিলে এখনি রওনা হতে পারে। ফুপার কাছে চলে যাও। এখানে এসেছিলে, এ কথা যেন কোনোদিন কেউ জানতে না পারে।

ততক্ষণে মেনাজদ্দি ফিরে এসেছিল। তার দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে বললেন, বুঝলি তো ? সে শুধু ঘাড় নাড়ল কলের পুতুলের মত। বৌটি মাথা লুটিয়ে দিল রামজীবনের পায়ের কাছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, দোয়া কর, বাপজান। ভালোয় ভালোয় গিয়ে যেন পেঁছতে পারি।

মেনাজদ্দি কি একটা বলতে যাচ্ছিল। রামজীবন আবার ধমক লাগালেন। হ্যারিকেনের মৃদু আলোকে দেখা গেল কয়েদীটার চোখদুটো ছলছল করছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। সমস্ত আকাশময় তার পুনরাগমনের আয়োজন। রামজীবন খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদ্যুতের আলোয় মনে হ'ল, বউটা ঐ দূরে থেকে ফিরে তাকাল। তারপর আর কিছু দেখা গেল না। দরজা বন্ধ করে খাটের উপর স্থির হয়ে বসলেন রামজীবন। কিন্তু মনের ভিতরে চললো অস্থির দ্বন্দ্বের আলোড়ন—দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী আমি। একি করে বসলাম? আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ; সরকারের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা! ছুটে গিয়ে আবার দরজা খুললেন। চীৎকার করে ডাকতে গেলেন, মেনাজদ্দি। ডাকা হ'ল না। চোখের উপর ভেসে উঠলো একটি কচি মেয়ের অশ্রুসজল মুখ। কোলে তার রুগ্ন শিশু। পাশে দাঁড়িয়ে একটা হতভাগা কয়েদী। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জেলের বাগান থেকে। তারপর গভীর রাতে বউয়ের হাত ধরে ফিরে এসেছে, তারি কাছে ধরা দেবার জন্যে।

বাকী রাতটুকু আর ঘুম এল না। কখনও বিছানায়, কখনও ঘরের ভিতর ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলেন রামজীবন। সকাল সকাল আফিসে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করলেন; সে চেষ্টাও সফল হ'ল না। থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন। সহকারী বিজনবাবু বললেন, আপনার কি অসুখ করেছে, স্যর?

—না, ঠিক অসুখ নয়। শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।

বিজনবাবু হেসে বললেন, আমাকে দু'দিন ছুটি দিন। বউদিকে নিয়ে আসি গিয়ে।

অন্যদিন হলে এর একটা সরস ও সস্নেহ উত্তর দিতেন রামজীবন। আজ শুধু মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। বিজনবাবু বুঝলেন, escape-এর ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি ভদ্রলোক। তাই একরকম জোর করেই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই। চারদিকে বর্ষণ-মুক্ত বর্ষার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী। রামজীবন খালের ধারে একটা ক্যাম্প চেয়ারে পড়ে ছিলেন। অপরাহ্নের রৌদ্রমুক্ত আকাশ গাঢ় নীল। এক ঝাঁক চিল উড়ে যাচ্ছিল। সেই-দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আর একটু উঠলেই ওদের ক্লান্ত ডানায় নীল জড়িয়ে যাবে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বিজনবাবু।

—কি খবর ?

—খুব ভাল খবর, স্যর। মেনাজদ্দিটা ধরা পড়েছে। এইমাত্র দিয়ে গেল পুলিস। ধোলাই-এর চোটে ফুলে ডবল হয়ে গেছে বেটা। চিনতেই পারছিলাম না। অনেক ডাকাডাকি করতে চোখ পিট পিট করে তাকাল একবার। হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। বাঁচবে কিনা কে জানে ?

রামজীবন আস্তে আস্তে বললেন, কোথায় ধরা পড়লো ?

—মাইল তিরিশেক দূরে নদীর মধ্যে, কোথায়। ঘোড়েল তো কম নয়। বউছেলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল নৌকো করে। পড়বি তো পড় একেবারে জলপুলিসের মুখে। কাপড়চোপড় বদলে ফেলেছিল; পায়ের কড়াটা খালি খুলতে পারেনি। তাতেই ধরা পড়লো।

একটু থেমে আবার বললেন বিজনবাবু, পুরোনো চোর; পালাবি, না হয় নিজেই পালা। আবার বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ঐ মেয়েমানুষ দেখেই নৌকো থামিয়েছিল পুলিস।

রামজীবন তার সহকর্মীর এই সরস কাহিনীতে যোগদান করবার চেষ্টা করলেন। মৃদু হেসে বললেন, বউ ছেলেও বুঝি ধরে এনেছে ঐ সঙ্গে ?

—আপনিও যেমন—মুখে একটা শব্দ করে বলে উঠলেন বিজনবাবু। বাচ্চাটা পথেই গেছে। মেয়েটাকেও কোথায় সরিয়ে ফেলেছে শুনলাম। ওরা বলছিল, পুরোনো চোরের বউ হ'লে কি হয়, দেখতে নাকি খাসা। এরকম তৈরী শিকার হাতছাড়া করবে, অত বোকা ওদের মনে করছেন কেন ?

·

রামজীবনের কাহিনী যখন শেষ হ'ল, বেশ রাত হয়েছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর বললাম, আপনার চাকরিটা যে এখনও টিঁকে আছে দাদা, এটা যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

উনি হেসে বললেন, টিঁকে আছে শুধু তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে !

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে একদিন দেখা হবে বলে।

—তা মন্দ নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে তো দেখা হ'ল অনেক পরে। তখন যারা ছিল তারা কিছুই জানতে পারেনিনি ?

—না। তবে পুলিস চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু ঐ বি-ক্লাসের মুখ থেকে রক্ত বেরিয়েছিল অনেক; কথা বেরোইনি একটাও।

বললাম, তাহলে আপনার জীবনের এই গোপন কাহিনীর আমিই কি একমাত্র শ্রোতা?

—না; আর একজন আছেন।

—কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি জানতে পারি?

—তোমার বৌদি।

সবিস্ময়ে বললাম, বৌদি! বৌদি জানেন সব?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন শুনে?

—কিছুই বলেননি। পরে একদিন ঐ প্রসংগ তুলে আপসোস করছিলাম, বড্ড ভুল করেছি। সেদিন ওসব ছেলেমানুষি না করে কয়েদীটাকে যদি পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতাম, কিংবা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতাম জেল-গেটে, এতদিন প্রোমশনও পড়ে থাকতো না, চাই কি সদ্য সদ্য পুরস্কারও হয়তো জুটে যেত একটা। শুনে তোমার বৌদি গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ; তবে সে পুরস্কার তুমি ভোগ করতে পারতে না।" বলেছিলাম, "কেন?" "ওটা আমার শ্রাদ্ধেই খরচ হয়ে যেত।" "তার মানে?" উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "এ'রকম কাণ্ডের পর গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন পথ থাকতো কি?"

আমার মুখে আর কোন কথা যোগাল না। শুধু বললাম, আপনি ভাগ্য-বান, দাদা।

উঠতে যাচ্ছি, কোথা থেকে ছুটে এলেন বৌদি—এ্যাঁক, উঠছেন যে?

—বাঃ, বাড়ি যেতে হবে না! রাত কত হ'ল খবর রাখেন?

—আমি খবর খুবই রাখি। আপনাদের যেন হঠাৎ খেয়াল হ'ল মনে হচ্ছে।

কাছে এসে স্বর নামিয়ে বললেন, বর্ষা রাত দেখে খিচুড়ি করেছিলাম।

আমি জবাব দেবার আগেই দাদা সাগ্রহে বলে উঠলেন, খিচুড়ি করেছ নাকি? বৌদির উত্তরে কৃত্রিম রোষ—হ্যাঁ। কিন্তু সে খবরে তোমার কি দরকার? তোমার বার্লি তৈরি হচ্ছে। পাঁচ মিনিট সবুর কর।

রামজীবন বাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে কি আজ বার্লি খেতে হবে ?

—জ্বরো মানুষ আর কি খেয়ে থাকে ?

দাদা আম্তা আম্তা করে বললেন, জ্বরটা যেন নেই বলেই মনে হচ্ছে। মাথাটা তো একদম ছেড়ে গেছে। দ্যাখ তো মলয়, হাতখানা।—বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। রামবৌদির মুখে কৌতুকহাসি ফুটে উঠলো। আমি বললাম, তা ঠিকই করেছেন। হাত দেখার কাজটা যোগ্য লোকের হাতেই দিয়েছেন, দাদা। আপনার খিচুড়ি পথ্যের ব্যবস্থা আমার মত ডাক্তার ছাড়া আর কেউ দেবে না, বলে নীরব অনুনয়ের দৃষ্টিতে বৌদির দিকে তাকালাম। উনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

## ॥ দুই ॥

—কেমন লাগছে আমাদের দেশ ?

বললাম, মন্দ কি! পাহাড় আছে, সমুদ্রও আছে.........

—কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই কোনোটারই, যোগ করলেন কবিরাজ মশাই। চারদিকের মাঠ ঘাট গাছপালার সঙ্গে ওরাও বেশ মিশে আছে। এ জিনিস কিন্তু আপনার দার্জিলিং মুশৌরীতে নেই, পুরী ওয়ালটেয়ারেও পাবেন না। এটা পাবেন শুধু এইখানে, এই চাটগাঁয়, আপনারা যাকে বলেন মঘের দেশ,—বলে, একটা বিচিত্রগড়ন নস্যের ডিবা থেকে দুটি ভীম টিপ্ উদ্ধত নাসারন্ধ্রে চালান করলেন। আমার চোখের উপর ভেসে উঠল একটি অতি পরিচিত দৃশ্য—আমাদের ম্যাগাজিন-সেন্ট্রী গজাধর সিং রাইফেলের নলে গুলি ভরছে।

রক্তিমাভ চোখ দুটি আমার মুখের উপর তুলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠলেন কবিরাজ, আরে মশাই, এই মঘের দেশেরই একদল ছেলে মেয়ে একদিন বাঘের মত লড়াই করেছিল আপনাদের ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে। কংগ্রেসী বাবুদের নিরামিষ চরকা-যুদ্ধ নয়, রীতিমত গোলা বারুদ বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ। প্রাণ দিয়েছিল, নিয়েও ছিল। তাদের পেছনে ছিল এই চাটগাঁর ইস্কুলের এক নগণ্য অঙ্কের মাস্টার। প্রতিশোধ নেবার পালা যখন এল, ইংরেজ তাকে ভোলেনি। যথারীতি ধরে নিয়ে ঝুলিয়ে দিল আপনার ঐ জেলখানায়।

কবিরাজ মশায়ের উত্তপ্ত কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন বাইরে অন্ধকারের দিকে। কিছুক্ষণ পরে আবার শুনতে পেলাম তার মৃদু গম্ভীর সুর—যেন কতদূর থেকে ভেসে এল কথাগুলো—, 'চাটগাঁর সূর্য অস্ত গেল। সঙ্গে যারা ছিল তারা আজ পচে মরছে দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে কোন্ আন্দামানের অন্ধকূপে। কে জানে, কবে

তারা ফিরবে ? একেবারেই ফিরবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে ?

কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত কেটে যাবার পর অনেকটা যেন আপন মনে বললেন কবিরাজ মশাই, 'তবু বলবো, জেলে গিয়ে ওরা বেঁচে গেছে। দাঁড়িয়ে দেখতে হয়নি তাদের ঐ একটি দিনের দুঃসাহসের কত বড় মূল্য দিয়েছে তার দেশ। জালিনওয়ালা বাগ নিয়ে আপনারা হৈ চৈ করে থাকেন। কিন্তু খবর রাখেন না, এই চাটগাঁর প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে দিনের পর দিন কী পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছিল একদল জানোয়ার। ডায়ার ওডায়ার নয়, বিদেশী গোরা পল্টন নয়, আমার আপনারই জাতভাই তারা। একটা ভদ্র গৃহস্থও রক্ষা পায়নি সে পশুগুলোর হাত থেকে। ছেলেগুলোর গেছে বুকের পাঁজর, মেয়েদের গেছে নারীধর্ম। আপনারা তো অনেক দেশের ইতিহাস পড়েছেন মশাই,'—হঠাৎ দীপ্ত প্রশ্ন করলেন আমার দিকে চেয়ে, 'দেখেছেন এর তুলনা ? স্বাধীনতার দণ্ড আছে জানি। কিন্তু এতখানি বিভৎস দণ্ড পেয়েছে কোনো দেশ, পৃথিবীর কোনো জাত ?'

সর্বনাশ ! কাকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসলেন কবিরাজ মশাই ? আমি জেলের লোক। ব্রিটিশ-রাজত্বে, লীগসরকারের চাকরি করি। নিছক সন্ধ্যা যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে খোসগল্পের লোভে পা দিয়েছিলম প্রতিবেশীর বৈঠকখানায়। এমন কামানের মুখে পড়তে হবে জানলে কখনো আসি ? ওঁর তীক্ষ্ম চোখদুটো তখনো আমার মুখের উপর উদ্যত। সেই দিকে একবার চেয়ে, কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, তারপর, এখানে মাছটাছ কি রকম পাওয়া যায় কবরেজ মশাই ?

মাছ !—চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি সহজ হয়ে এল। মুখে ভরে উঠল প্রসন্ন সরল হাসি। রাইফেলের নলে আর একবার বারুদ চালিয়ে বললেন, মাছ ? হ্যাঁ; তা পাবেন বৈ কি ? সব রকমই পাবেন। তাছাড়া রয়েছে চাটগাঁর নিজস্ব বস্তু—সুঁটকি আর লইট্যা। রাঁধতে পারলে অতি উপাদেয় খাদ্য।

বললাম, ঐখানেই তো মুশকিল।

—কেন ?

—আজ্ঞে, রাঁধতে হ'লে তাকে ঘরে আনতে হবে তো ?

—অসুবিধা কিসের ?

—অপরাধ না নেন তো বলি।

—সেকি! অপরাধ নেবো কেন! বলুন না?

—আপনাদের পাঁচজনের কাছে সুখ্যাতি শুনে একটু লোভ হ'ল। গেলাম একদিন সুঁটকির বাজারে। আধসের টাক মাল বেশ করে প্যাক করে নিয়ে যখন বাড়ি ঢুকলাম রাত দশটা বেজে গেছে। গৃহিণী ঘুমিয়ে পড়েছেন। মতলব ছিল, সেই ফাঁকে ডাক্তার বাবুতে আর আমাতে বাইরের ঘরে স্টোভ জেবলে—। জিনিসটা নাবাতে না নাবাতেই নাকে কাপড় দিয়ে উনি এসে উপস্থিত। হাত দিয়ে পোঁটলাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আধমাইল দূরে ফেলে দিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে নেয়ে এসো লালদীঘি থেকে। মাথা চুলকে বললাম, তুমি এখনো ঘুমোওনি? উনি যেতে যেতে বললেন, মড়া বেঁচে ওঠে ঐ গন্ধে আর আমার তো শুধু ঘুম।

কবিরাজ মশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এ তো গেল সুঁটকি। আর একটার কী খবর?

—আর একটা মানে লাইট্যা? সে ইতিহাস আরো করুণ। চারকরটা একদিন পাতায় করে নিয়ে এসেছিল খানিকটা। দেখেই সে কী বমি! খবর পেয়ে ছুটে এলাম আফিস থেকে। একটু সুস্থ হয়ে বললেন, লোকটাকে আজই তাড়িয়ে দাও। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ভীষণ রেগে উঠলেন উনি, কেন আবার! কোত্থেকে এক দলা গয়ের তুলে এনে বলছে কিনা মাছ! আমি যেন আর মাছ চিনি না?

কবিরাজ মশাই সস্নেহে বললেন, এই ব্যাপার? আচ্ছা দাঁড়ান। আপনার মুশকিল আসান করে দিচ্ছি,—বলে, অন্দরের দিকে ফিরে হাঁক দিলেন, মিনু, মিনু আছিস?

নেপথ্যে উত্তর এল, যাই বাবা।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল একটি গৌরী তরুণী। স্বাস্থ্যে এবং বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। কবিরাজ বললেন, মিনু, তোমার কাকাবাবুকে প্রণাম কর। আমাদের বিশেষ বন্ধু। জ্ঞানবাবুর জায়গায় এসেছেন—

—জানি, বলে মিনু এগিয়ে এসে আমার পায়ে হাত দিতে প্রণাম করল। হাসিমুখে বলল, কাকীমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জানো বাবা, কাকাবাবু একজন সাহিত্যিক। খুব ভালো লেখেন।

কবিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তাই নাকি! কই, সেকথা তো এতক্ষণ বলেননি, মশাই? আপনি দেখছি, একটি বর্ণচোরা আম।

বললাম, কিন্তু বড্ড টক।

—টক না মিষ্টি বুঝতে দিলেন কৈ? সন্ধ্যা থেকে আমিই তো কেবল আবোল তাবোল বকে মরছি, আর একজন জলজ্যান্ত লেখক চুপ করে বসে আছেন!

বললাম, লেখকরা তো বকে না, লেখে।

—আর বাজে লোককে বকতে দিয়ে লেখার রসদ যোগাড় করে, কি বলেন?

বলে হাসতে লাগলেন কবিরাজ মশাই।

মিনু বললে, তোমার সামনে কারো মুখ খোলবার উপায় আছে? কি বকতেই পার!

—তা, যা বলেছিস। ওঃ, হ্যাঁ, তোকে যে জন্যে ডেকেছিলাম। কাকীমার সঙ্গে শুধু ভাব করলে হবে না, ও'কে আমাদের এই মাছ টাছ গুলো রাঁধতে শিখিয়ে দাও। তার আগে, মানে কালই, কাকাবাবুকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দাও তো তোমার দু-একখানা রান্না। জানেন, মলয়বাবু, আমার এই মায়েব হাতের সুঁটকির ঝোল আর লইট্যার বড়া একদিন যদি খান, আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

—হ্যাঁঃ, তোমার তো সবই বাড়াবাড়ি,—বলে মিনু ভিতরে চলে গেল। বলে গেল, আপনি উঠবেন না, কাকাবাবু, আমি চা নিয়ে আসছি।

মিনু চলে গেলে কবিরাজ মশাই জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কদিন হ'ল আপনার?

—মাসখানেক হ'ল।

—দেখুন মজা। পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। এদ্দিনে আমাদের পরিচয় সবে শুরু হ'ল। তাও, আপনি দয়া করে এলেন বলে। আর, ওদের, মানে মিনু আর তার কাকীমার অবস্থা দেখুন—বলে ভদ্রলোক আবার তাঁর সেই অট্টহাসির ঝড় তুললেন।

কবিরাজ মশাই মিথ্যা বলেননি। আলাপচর্যায় স্ত্রীজাতি চিরকালই অগ্রণী। তার কারণ এ নয়, যে সামাজিক সৌজন্যে কিংবা হৃদয়ের ঔদার্যে তারা পুরুষের চেয়ে অগ্রসর। তার কারণ এই যে, বাক্য জিনিসটার গতি পুরুষের বেলায় অন্তর্মুখী, আর নারীর বেলায় বহির্মুখী। কথা আমরা হজম করি আর ও'রা বমন করেন। সেইজন্যে সংসারে স্ত্রী বক্তা আর পুরুষ শ্রোতা। নারীজাতি দুটি ক্ষেত্রে অমিতব্যয়ী—অর্থ এবং বাক্য, অবশ্য প্রথমটা

যেখানে নিজের অর্জিত নয়।

এই কলকাতা শহরেই দেখতে পাবেন, বোস আর বাঁড়ুয্যে পঁচিশ বছর ধরে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করছেন। কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করেননি। প্রতি সন্ধ্যায় আফিস থেকে ফিরে আট হাতি ধুতির উপর ফতুয়া চড়িয়ে পরস্পর-সংলগ্ন রোয়াকে বসে স্টীলের কাপে চা পান করতে করতে তারা পরস্পরকে নয়নবাণে বিদ্ধ করেন, কিন্তু বাক্য-সূত্রে স্পর্শ করেন না। ছাদের উপরে যান। সেখানকার দৃশ্য অন্যরূপ। সেখানে বোসজায়া এবং বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে কিংবা বৈকালিক প্রসাধনের পর নিজের আলিসার পাশে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বড়ি আচার দোক্তা এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখের বিনিময় করে থাকেন।

রেলে করে যাচ্ছেন কোনো দূর পথে। আপনি এবং আপনার সহযাত্রী চব্বিশ ঘন্টা পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে কাটিয়ে দিলেন। অপাচ্য রেলওয়ে উপন্যাস চিবিয়ে, ঘুমিয়ে, হাই তুলে, রুক্ষ মাঠের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করে সময় আর কাটে না। আলাপ করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বরফ ভাঙতে এগিয়ে এলেন না কেউ। ঠিক পাশে, জেনানা কামরায় চলেছেন আপনাদের 'সংসার'-দ্বয়। তারা কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই জমে গেছেন, যেন কতকালের চেনা। দুটো স্টেশন পার হতে না হতেই উভয়েই প্রমোশন পেয়েছেন দিদি থেকে ভাই, এবং 'আপনি' থেকে 'তুমি'র কোঠায়। দুজনেই বলছেন, শুনছেন না কেউ। মিলিত কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে ডুবে গেছে রেলগাড়ির হুংকার। জংশন স্টেশনে গাড়ি থামলে আপনি নেমে গিয়ে হেঁকে বললেন, সব গুছিয়ে টুছিয়ে নাও। আর দুটো স্টেশন বাকি। উত্তর পেলেন না। শুনতে পেলেন, 'উনি' হেসে বলছেন 'তিনি'-কে, দেখলে তো ভাই, কি রকম ব্যস্তবাগীস মানুষ নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে। দুটো স্টেশন পরে নামতে হবে; এখন থেকেই তাড়া দেওয়া শুরু হ'ল।

তিনি বললেন, আমার উনি আবার এর চেয়েও এককাঠি সরেস। সেবার হ'ল কি জানো, ভাই ?......

মিনু চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিঞ্চিৎ 'ইত্যাদি'। বললাম, শুধু চা'ই বরং দাও আজ। বাকী সব আরেক দিন এসে খাবো। অসময়ে কিছু খেলে আমার আবার—

বেশ তো, বাধা দিয়ে বললেন কবিরাজ মশাই, আপনার যা ইচ্ছা করে, তাই খান। আমাদের শাস্ত্রে বলে খাওয়া নিয়ে জোর করতে নেই। আচ্ছা, দাঁড়ান। একেবারে খালি চা'টা খাওয়া ঠিক হবে না। একটা নতুন উপকরণ দিচ্ছি।

আলমারি খুলে মারবল আকারের দুটি গোলাকৃতি কালো পদার্থ আমার ডিশের উপর রাখলেন।

মিনু বলল, কি জিনিস, চিনতে পাচ্ছেন তো? একটু লক্ষ্য করে বললাম, কালোজাম বলে মনে হচ্ছে। বহরমপুরে বলে ছানাবড়া। তবে সেগুলো এর চেয়ে বড় বড়।

দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসি।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তবে কি নারকেলের নাড়ু?

কবিরাজ মশাই বললেন, নাঃ। আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এটা হচ্ছে চ্যবনপ্রাস, বলবীর্য কান্তিবর্ধক, শ্লেষ্মানিবারক।—বলে একটা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে দিলেন।

মিনু বলল, আমার খাবার তো আপনার পছন্দ হ'ল না। এবার খান চ্যবনপ্রাস দিয়ে চা।

বললাম, তা মন্দ নয়। চায়ের সঙ্গে চ্যবনপ্রাস: বেশ অনুপ্রাস আছে কিন্তু।

কিছুদিন পরের ঘটনা। কবিরাজ মশায়ের বৈঠকখানায় সন্ধ্যাযাপন ইতি-মধ্যে প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজলিসি লোক। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তেমনি অপূর্ব তার রসঘন পরিবেশন। সেটা বোধ-হয় মাঘমাস। জমাট শীত। সন্ধ্যা থেকে গল্পের আসর যেটা বসেছিল সেটাও কম জমাট নয়। ফাঁকে ফাঁকে চলেছে চ্যবনপ্রাস এবং অন্যান্য উপকরণ যোগে গরম চা। দ্বিতীয়-পর্ব শেষ হবার পর আবার জল চড়বে কিনা জানতে এসেছিল মিনু। একজন পুলিশ-অফিসার ঘরে ঢুকলেন। সামনের একটা চেয়ার দখল করে কবিরাজ মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন, মার্প করবেন। অসময়ে বিরক্ত করলাম। আপনার চাকরটিকে একবার ডেকে পাঠান তো।

কবিরাজ মশায়ের বিস্মিত প্রশ্ন—চাকর! মানে বিপিন? তার আবার কি হ'ল?

—দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

আমার পক্ষে আর বসে থাকা সমীচীন নয়। বললাম, আমি তাহলে উঠি আজকার মত।

কবিরাজ মশাই বললেন, বসুন না একটু।

দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে অপ্রসন্ন মুখে বললেন ওয়ারেন্ট্ টোয়ারেন্ট্ আছে নাকি? যে দিনকাল পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস নেই, মশাই।

—একবার ডাকুন না; বলছি সব।

কবিরাজ অন্দরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, বিপিনকে একবার এদিকে পাঠিয়ে দে তো, মিনু।

ভেতর থেকে জবাব এল, বিপিন বাড়ি নেই, বাবা।

—কোথায় গেল?

—তার মার অসুখ। বিকালের গাড়িতে বাড়ি চলে গেছে।

—ও, তাই সন্ধ্যা থেকে দেখছি না হতভাগাকে।

দারোগাবাবু মৃদু হেসে একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন, ভারী আশ্চর্য তো! চাকর ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল, আর আপনি সে খবরটাই রাখেন না।

কবিরাজ মশাই স্পষ্ট বিরক্ত হলেন। বললেন, এতে আর আশ্চর্য কি দেখলেন? চাকর বাকরের খবর মেয়েরাই রাখে।

—যাক্। আমাদের খবর কিন্তু অন্য রকম। আপনার বাড়িটা একটু সার্চ করতে চাই। এই নিন ওয়ারেন্ট।

কবিরাজের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, বেশ, করুন।

দারোগাবাবু আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন, আপনি—

পরিচয় দিলাম। উনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আপনি যখন উপস্থিত আছেন, স্যার, Witness হিসাবে আমাদের সঙ্গে একটু থাকলে ভালো হয়।

নিতান্ত অনিচ্ছায় হ'লেও রাজী হতে হ'ল।

ভিতরে ঢুকতেই জানালা দিয়ে নজরে পড়ল বাড়ির বাইরে চারদিক ঘিরে লালপাগড়ির ঘনলাইন। একতলাটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। তারপর

আমরা সদলবলে উপরে উঠে গেলাম। খান তিনেক ঘর। প্রথমটায় থাকেন কবিরাজ মশাই। পরেরখানা তার ছেলের। বর্তমানে খালি। মালিক বীরভূমের কোন্ গ্রামে অন্তরীন। দুটোতেই দস্তুর মত পুলিসী তল্লাসি শেষ হ'ল। তৃতীয় ঘরের সামনে যেতেই উনি বললেন, এখানে আমার মেয়ে থাকে। এটাও দেখতে চান ?

সকুণ্ঠ উত্তর এল দারোগাবাবুর, আজ্ঞে, এলাম যখন—

—বেশ। মিনু একটু বাইরে এসো, মা। ওরা তোমার ঘর সার্চ করবেন।

মিনু দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, কেন বাবা ?

—বিপিনটা লুকিয়ে আছে কি না, দেখতে চান।

মিনু সেইখানে দাঁড়িয়েই বলল, যা খুশি চাইলেই তো আমরা দিতে পারি না, বাবা। ওদের না হয় লজ্জা সরমের বালাই নেই। আমাদের তো মান সম্ভ্রম বলে একটা কিছু আছে। কি বলেন, কাকাবাবু ?

বলা বাহুল্য "কাকাবাবুর" পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নিরুত্তর রইলাম। উত্তর দিলেন পুলিস অফিসার। বললেন, লজ্জা সরম আমরাও একদম খুইয়ে বসিনি, মিস্ সেন। কিন্তু লজ্জা করে ঠকার চেয়ে একটু নির্লজ্জ হয়ে যদি জেতা যায়, সেইটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?

—তার মানে ?

—মানে, আপনাকে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে।

—যদি না সরি ?

—আমাদের বাধ্য হয়ে সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝতেই পারছেন।

—বেশ; তাই করুন।

সহজ কণ্ঠ। কোথাও নেই এতটুকু উত্তাপের আভাস। দারোগার দিকে তাকালাম, এবং তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফেরালাম মিনুর মুখের উপর। শিউরে উঠলাম। মনে হ'ল, একে আমি কোনদিন দেখিনি। এ মেয়ে নয়, প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা। কোমল নারীদেহ নয়, তার প্রতি অঙ্গ থেকে ঠিকরে পড়ছে ইস্পাতের দীপ্তি এবং দৃঢ়তা। মুহূর্ত কাল সেই দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কটি ভীতিবিহ্বল শব্দ...না-না...।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। এগিয়ে এসে সহজ ভাবেই বললাম, এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, মিনু। ওরা বাড়ি সার্চ করতে এসেছেন। সঙ্গে

ওয়ারেন্ট আছে। তোমার পক্ষে বাধা না দেওয়াই উচিত।

—নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন কবিরাজ মশাই, তুই সরে আয়, মা। করুক ওদের যা খুশি।

মনে হ'ল মিনুর চোখেও যেন স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এসেছে। একবার আমার একবার ওর বাবার মুখের দিকে চেয়ে দরজা ছেড়ে চলে গেল।

দারোগাবাবু সদলবলে ঘরে ঢুকে প্রথমে কোণগুলো দেখলেন। আলনা এবং আলমারির পেছনে উঁকি মারলেন। তারপর খাটের নীচে একবার তাকিয়ে দুজন কনস্টেবলকে হুকুম করলেন, উস্‌মে কোন্ চীজ্ হ্যায়, নিকালো।

ওরা নীচে গিয়ে একটা কম্বলে জড়ানো বান্ডিল টেনে এনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিল। কম্বলটা খুলে পড়তেই কবিরাজ মশাই চমকে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কি! বিপিন!

পরদিন যথারীতি হাজতি আসামী-রূপে বিপিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করল। ওয়ারেন্ট পড়ে দেখলাম, নাম রয়েছে সঞ্জয় চ্যাটার্জি ওরফে বিপিন দাস। চার্জ—আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতি। ঘটনাস্থল—উত্তর ভারতের কোনো বড় শহর। কাল বৎসরাতীত। পুলিসের কোনো কর্তাব্যক্তির মুখে শুনলাম, একটি বিশিষ্ট ধ্বংসধর্মী রাজনৈতিক দলের ইনি অন্যতম পান্ডা। একাধিক খুন এবং ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। পুলিস যথারীতি পশ্চাদ্ধাবন করেও বহুদিন একে কবলস্থ করতে পারেনি। হঠাৎ হয়তো শোনা গেল, বৌবাজারে কালু দপ্তরী লেনের মোড়ে ছলিমদ্দি নামে যে দর্জিটি চমৎকার ট্রাউজার কাটে, উনিই হচ্ছেন স্বনামধন্য সঞ্জয় চ্যাটার্জি। পরদিনই দেখা গেল, দোকান বন্ধ, মালিক রাতারাতি উধাও। আবার কিছুদিন পরে খবর দিলে কোনো গুপ্তচর, কুমিল্লার ফৌজদারী আদালতের বটগাছতলায় যে জ্যোতিষী ঠাকুর মামলাকারীদের হস্তরেখা পরীক্ষা করে জয়-পরাজয় নির্ণয় করেন, এবং সোয়া পাঁচ আনার মাদুলি ধারণের ব্যবস্থা দিয়ে বেশ দুপয়সা পকেটস্থ করে থাকেন, তিনিই হচ্ছেন সঞ্জয়ের নবতম সংস্করণ। ঊর্ধ্বতন মহলে কথাটা পৌঁছবার আগেই জ্যোতিষীর অন্তর্ধান। এমনি একটা কোনো সূত্রে শেষটায় রিপোর্ট পেলেন

চিটাগং ডি. আই. বি., যে এই বহু-বাঞ্ছিত ব্যক্তিটি কিছুদিন হ'ল, কবিরাজ সদানন্দ সেনের বাড়িতে ভৃত্য-রূপে অবস্থান করছেন। এ চাকরির গোপন সুপারিশ এসেছে কবিরাজের ইন্টার্নী পুত্রের কাছ থেকে, এবং মঞ্জুর করেছেন তার তরুণী কন্যা।

পুলিস প্রধানটি বললেন, শীকার এবারেও ফসকে যেত, মশাই, আটকে গেছে নেহাত সরকারের কপালগুণে। সেজন্যে অবিশ্যি আমাদের বাহাদুরি কিছু নেই। সংসারে এমন শেকল আছে, যা পুলিসের শেকলের চেয়েও শক্ত। তাতেই শেষটায় জড়িয়ে পড়ল সঞ্জয় চাটুয্যে। শ্রীমতী মিনু সেনের কাছে সেজন্যে আমরা অনেকখানি ঋণী।

বললাম, কিন্তু আমি যেন শুনলাম, মেয়েটাকে অ্যারেস্ট করছেন আপনারা।

—আমার দারোগাবাবুদের তাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আইনই তো সব নয়। পুলিস হলেও কৃতজ্ঞতা জিনিসটা আমাদের অভিধানেও আছে। তাই ওদের বললাম, মিনু সেনকে দেবার যদি কিছু থাকে সেটা হাতকড়া নয়, ফুলের তোড়া। তাই নিয়ে হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে এসো।

একটু বাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কেউ সাহস করছে না এগোতে। কাজটা আমাদের হয়ে আপনিই করুন না। আপনার তো বেশ যাতায়াত আছে শুনতে পাই। শ্রীমতীও নাকি আপনার খুব ভক্ত।.. Congratulations!—বলে আমার ডান হাতে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে পুলিস-প্রধান নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সরকারের খাতায় যে পরিচয়ই থাক, জেলের মধ্যে বিপিন দাস একেবারে নির্ভেজাল বিপিন দাস। সেই চাকরদের মত হাঁটু পর্যন্ত তুলে কোমরে গুঁজে কাপড় পরা। খালি গা; গলায় তুলসির মালা। চোখে সদা-শঙ্কিত দৃষ্টি। জোড় হাত করেই আছে, জেলর সাহেব থেকে মেট সাহেব পর্যন্ত সবার কাছে। বড় জমাদার মজিদ খাঁ তো হেসেই খুন। এ কী রকম স্বদেশী আসামী। পুলিসের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। এ নাকি আবার ডাক্যাতি করে, বোমা ছোঁড়ে, পিস্তল চালায়! যত সব—

তবু পুলিসের রিপোর্ট মত সেল ব্লকেই রাখতে হয়েছে বিপিনকে। সেখানে সে সিপাই-জমাদারদের ফাই ফরমাস খাটে, ইয়ার্ড ঝাঁট দেয়, ঘরে ঘরে জল তোলে, ছোট খাট 'স্বদেশী' বাবু বা অন্যান্য 'ডিভিশন' বাবু যারা আছেন, তাদের কাপড় কাচে, জুতো ব্রুশ করে, বিছানা ঝেড়ে মশারি খাটিয়ে দেয়।

বুট পট্টি পাগড়ি খুলে সিপাই বাবাজিরা যখন তাদের দ্বি-প্রাহরিক আয়াস উপভোগ করেন, বিপিন তার সঙ্গে যোগ করে নিপুণ হাতের পদসেবা কিংবা দলাই-মলাই। আয়াস থেকে আসে আরাম, এবং তার থেকে নিদ্রা।

কথাটা আমার কানে গেল, এবং সিপাই বাহিনীর এই সুখনিদ্রা আমার অনিদ্রার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিপিন-সম্বন্ধে তারা যতখানি নিশ্চিন্ত হ'তে লাগলেন, আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠল ততখানি। আমি যে জানি, দেখে এবং ঠেকে শিখেছি, এই শ্রেণীর মহাজনদের এইটাই সনাতন পন্থা। এমনি করে যাদের বশে ওঁদের ওঠাবসার কথা, তাদেরই একদিন বশ করে কোথা দিয়ে ওঁরা নিঃশব্দে সরে পড়েন, কেউ জানতে পারে না। এর বেলায় যদি তেমন কিছু ঘটে, অর্থাৎ সঞ্জয় চ্যাটার্জি যদি অকস্মাৎ প্রাচীর লঙ্ঘন করেন, আমার চাকরিটিও যে তার সহগামী হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এতদিনের এবং এতকষ্টের অর্জিত ধন হাতছাড়া হলে, সরকারের হাতে আমারও ছাড়া নেই। অতএব সেই কর্তাব্যক্তিটির শরণ নিলাম। বললাম, এ বোঝা তো আমারও নয়, আপনারও নয়। কতদিন আর আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন? পাঠিয়ে দিন না যাদের জিনিস, তাদের কাছে—সেই কোন্ হরিদ্দার না কানপুর। একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।

উনি চিন্তান্বিত মুখে বললেন, ঘুম আমারও চলে গেছে, মিস্টার চৌধুরী। খবর পেয়েছি, গোপন পথে চিঠি-চলাচল শুরু হয়ে গেছে।

চমকে উঠলাম, বলেন কি!

—হ্যাঁ। তবে, এখনো মনে হচ্ছে এক তরফা। শ্রীমান লেখক, আর শ্রীমতী পাঠিকা। উল্টো স্রোত যখন বইবে, অর্থাৎ শ্রীমতী যখন লেখিকার রোল্ নেবেন, তখনই ভাবনার কথা। তার আগে যেমন করে হোক, পাপ বিদায় করতেই হবে। আমার তরফে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এটুকু জেনে রাখুন।

বিরক্তির বোঝা নিয়ে ফিরলাম এবং আফিসে এসেই ডেকে পাঠালাম বিপিন দাসকে। সেই গবেটমার্কা চাকরের মুখোশ পরে জোড় হাত করে দাঁড়াল এসে আমার আফিসের জানালায়। জমাদারকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে জানতাম। কিন্তু এসব কি হচ্ছে, সঞ্জয় বাবু?

এমনি ধারা সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ ও বোধহয় আশা করেনি। তাই প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করল। সে শুধু কয়েক সেকেন্ড। পরক্ষণেই মুখের উপর যখন দৃষ্টি ফেললাম, বিপিন দাস মিলিয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে সঞ্জয় চ্যাটার্জি।

মাথাটা একপাশে একটু হেলিয়ে মৃদুহাসির সঙ্গে বলল, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না জেলর বাবু।

—বুঝতে ঠিকই পারছেন। এ শুধু না বোঝার ভান। নিজে ডুবেছেন, ডুবুন। ঐ মেয়েটাকে ডোবাচ্ছেন কেন? আপনার পথ আর ওর পথ তো এক নয়।

জবাব এল স্থির গম্ভীর কণ্ঠে, এর উত্তর আজ আপনাকে দিতে চাই না, মিস্টার চৌধুরী। যাবার দিন দিয়ে যাবো। আজ শুধু এইটুকু বলবো, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আপনাকে বিব্রত বা বিপন্ন করবার মত কোনো কিছুই আমি করিনি এবং করবো না।

কোনো কোনো মানুষের কথার মধ্যে জাদু থাকে, গল্পে পড়েছি। কারো কারো বলবার এমন একটা ভঙ্গী আছে, যা শ্রোতাকে মোহগ্রস্ত করে, এটাও ছিল শোনা কথা। আজ এ দুটোকেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করলাম। সেদিনের ঘটনার পর থেকে মিনুর উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়েছিল। হঠাৎ কেমন মায়া হ'ল মেয়েটার উপর।

কবিরাজ মশায়ের বৈঠকখানায় আমাদের সান্ধ্য আসর সেদিন থেকে আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আসর যে আবার কোনোদিন খুলবে, এ আশাও অবশ্য ছিল না। মেয়েমহলের সম্পর্কটাও অনুরূপ হবে, এটাই স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়েছিলাম। তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলা আফিস থেকে ফিরে যখন দেখলাম আমার রান্নাঘরের বারন্দায় মিনু আর তার কাকীমা বেশ আগের মতই জমিয়ে বসেছেন, বিস্মিত না হয়ে পারিনি। কিন্তু তার মধ্যে অনুমাত্র পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল না। আমি বাড়ি ঢুকতেই কল-কণ্ঠে বলে উঠল, কই, আপনাকে তো আজকাল আর দেখতে পাই না, কাকা-বাবু?

ঠিক সহজ ভাবে জবাব দিতে পারলাম না। আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম, বড্ড কাজ পড়েছে কদিন হ'ল।

—হ্যাঁ! সন্ধ্যার পরে আবার কাজ কিসের আপনার?

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বসবার ঘরে চলে গেলাম। মিনু উঠে এল আমার পেছনে। কাছে এসে বলল, বাবা বড্ড মুষড়ে পড়েছেন। আপনি এমনি করে যাওয়া বন্ধ করলে তো চলবে না।

একটুখানি চিন্তা করে বললাম, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি মিনু?

—ও মা, রাগ্ করবো কেন ?

—একটু ঘুণাক্ষরেও যদি জানতে পেতাম, তা হলে—

—তাহলে কী ? আমাকে সরে যেতে বলতেন না, এই তো ? কিন্তু আপনি জানেন না কাকাবাবু, সেদিন আমাকে, আর শুধু আমাকে নয়, পুলিস যাকে ধরতে এসেছিল, তাকেও আপনি কতখানি রক্ষা করেছেন।

—রক্ষা করেছি ! আমি !

—হ্যাঁ, আপনি। আমার কি ছাই মাথার ঠিক ছিল ? আপনি না বললে আমি দরজা ছেড়ে কিছুতেই যেতাম না। আর ঐ পুলিসের লোকটাও ঠিক তাই চাইছিল।

—বল কি !

—হ্যাঁ। ওর ঐ সাপের মত চোখদুটোর দিকে একবার তাকিয়েই তা আমি বুঝেছিলাম।

—কিন্তু, তুমি ভুল করনি তো ?

—না, কাকাবাবু। ওখানটায় কোনো মেয়েমানুষই কোনোদিন ভুল করে না।

আমি চুপ করে সেদিনকার দৃশ্যটার উপর মনে মনে চোখ বুলিয়ে গেলাম। মিনু বলল, 'ওরা যখন আমার গায় হাত দিত, একবার ভেবে দেখুন কি করতেন আপনি, কি করতেন বাবা, আর কি করতো সে, যাকে ধরবার জন্যে ওদের এত তোড়জোড়। তখনো সে খাটের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকত, এটা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না। কিন্তু তারপর ? মাগো ! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। দারোগার কোমরে পিস্তল ছিল। এতবড় সুযোগ সে নষ্ট করত না।'

মিনু চোখ বুজল। তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। একবার ভাবলাম, বলি, যে পরিণাম কল্পনা করে তুমি এমন করে শিউরে উঠছ, সেটা তো ওঁর জীবনে আকস্মিক ঘটনা নয়, যে কোনো মুহূর্তেই আসতে পারে।

কিন্তু সেই বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে এই রূঢ় সত্যটা আর মুখ থেকে বেরোল না।

দিন কয়েক পরেই খবর এল বিপিন দাসকে কানপুরে চালান দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। যাবার আগের দিন আমার একজন অফিসার এসে বললেন, বিপিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—বেশ তো; আসতে বলুন।

অফিসারটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'একা আসতে চাইছে। বলা যায় না, হয়তো কনফেশন করার মতলব। অত বড় Inter Provincial Case--এর আসামী, একটু বাজিয়ে দেখবেন, স্যর। যদি কিছু বের করা যায়, মোটা রিওয়ার্ডের সম্ভাবনা রইল।' হেসে বললাম, 'তাই যদি হয়, আপনি বঞ্চিত হবেন না, সতীশবাবু।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ওর চোখের ভিতর খুশী আর লোভ একসঙ্গে জ্বল জ্বল করে উঠল।

বিপিন আমার টেবিলের উপর একখানা খামে-আঁটা চিঠি রেখে বলল, 'আপনার সেদিনকার প্রশ্নের উত্তর।' শিরোনামাটায় চোখ বুলিয়ে বললাম, 'কি রকম! প্রশ্ন করলাম আমি, আর তার উত্তর পাবে শ্রীমতী মিনতি সেন?'

—চিঠিটা ওরই। কিন্তু দেবার আগে আপনি একবার পড়ে দেখবেন। আসামীদের চিঠি সেন্সর করতে হয় তো? আমার বেলায় ও কাজটা না হয় আপনি নিজেই করলেন, মিস্টার চৌধুরী, বলে হাসতে লাগল।

চিঠিখানা পকেটস্থ করলাম।

অনেকদিন পরে আবার হানা দিলাম কবিরাজ মশায়ের বৈঠকখানায়। নতুন চাকর বহাল হয়েছে। বলল, 'কাকে চাই?'

—যাকে হোক ডেকে দাও।

—বাবু তো বাড়ি নেই।

—দিদিমণি আছে তো? তাকেই ডাকো।

লোকটা আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলোতে লাগল—সাধুভাষায় যাকে বলে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ। এমন সময় ঘরে ঢুকল মিনু।

—ওমা, কাকাবাবু কখন এলেন? বসুন, চা নিয়ে আসছি।

—চা পরে হবে। তোমার একটা চিঠি আছে।

—আমার চিঠি! কে দিলে?

—পড়লেই বুঝতে পারবে।

বন্ধ খামখানা তার হাতে দিলাম। লেখাটার উপর চোখ পড়তেই কে

যেন একরাশ সিন্দুর মাখিয়ে দিল গৌরবর্ণ মুখের উপর। আমার দিকে চোখ না তুলেই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

চা এল চাকরের হাতে। একটু একটু করে দশমিনিট ধরে কাপটা শেষ করলাম। উঠতে যাবো, এমন সময় সে এল। সদ্য ধোয়া চোখ মুখ লক্ষ্য করলাম। তার উপর একটি চেষ্টাকৃত ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি পড়েছেন?'

বললাম, 'পরের চিঠি; অনুমতি না পেলে পড়ি কি করে?'

—অনুমতি তো লেখকই দিয়ে গেছেন। শুধু অনুমতি নয়, অনুরোধ। আপনি পড়ুন। আমি আসছি।—

বলে বেরিয়ে গেল। চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম—

মিনু,

সেদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমাদের দীক্ষার মন্ত্র কি। আজ সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমাদের একটি মাত্র মন্ত্র। তার প্রথম এবং শেষ কথা হ'ল-দেশ। ব্যক্তি আমাদের কাছে মিথ্যা, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অর্থহীন। বন্ধন নেই, আকর্ষণ নেই। পেছন ফিরে তাকানো আমাদের গুরুর নিষেধ। তবু যে আজ যাবার আগে নিজের কথা শোনাতে বসেছি, তার কারণ জানতে হলে চিঠিটা তোমাকে শেষ করতে হবে।

মাকে হারিয়েছিলাম যখন আমার বয়স সাত। ভাই বোন কেউ ছিল না। পরের বাড়িতে অনাদরে মানুষ। সংসারের যে একটা কোমল দিক আছে, যেখানে মানুষ ভালবাসে এবং ভালবাসা পায়, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কৈশোর থেকে আমি বিপ্লবী। যে জীবন বেছে নিয়েছি, তার একটি মাত্র রূপ। সে রূপ কর্তব্যে কঠোর, প্রতিজ্ঞায় নির্মম। স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া আমাদের বিদ্রূপের বস্তু। নারী আমাদের কাছে দুর্বলতার প্রতীক। তাকে এড়িয়ে চলতে হবে; এই হ'ল আমাদের creed.

আমার জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে পাহাড়ে, জঙ্গলে, উন্মুক্ত আকাশ তলে। শুধু কাজ আর কাজ। দিনরাতগুলো ভারী প্রোগ্রাম দিয়ে ঠাসা। ইঁটের মত নিচ্ছিদ্র নিরেট। পথে বিপথে, গৃহ-জীবনের ছায়ায় যখন এসেছি, মেয়েদের কাছে পেয়েছি প্রাণপূর্ণ আতিথ্য এবং সাগ্রহ আশ্রয়। পেয়েছি স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা। যাবার সময় দেখেছি কারো ম্লানমুখ, কারো বা চোখের জল। কিন্তু মনের ওপর ছাপ পড়েনি কোনোদিন। সঞ্চয় করিনি কিছুই।

যা পেয়েছি, দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে চলে গেছি। এই ছিল আমার জীবনের ধারা। সে-ধারা বদলে গেল, যেদিন এলাম তোমাদের বাড়ি। তোমার দেখা যখন পেলাম, কি মনে হ'ল, জানো? মনে হ'ল, আমার মধ্যে কোথাও একটা অভাব ছিল, এতদিনে সেটা পূর্ণ হ'ল। যা পেলাম, তারি জন্যে যেন অপেক্ষা করেছি, সারাজীবন। সে যেন এক পরম সম্পদ, যে আজ মিটিয়ে দিল আমার সকল দৈন্য, ভরে দিল আমার সকল শূন্যতা।

'তবু ভাবছি, এ দেখা যদি আমাদের না হ'ত! আমি যে বিপ্লবী। আমার পথ চিরন্তন ধ্বংসের পথ। সে পথে শুধু রক্ত, শুধু হিংসা, শুধু মৃত্যু। সেখানে তো অমৃতের স্থান নেই। তোমার এ মহাদান সেখানে ব্যর্থ হ'য়ে গেল, যেমন করে ব্যর্থ হয় মরুভূমির বুকে বৃষ্টিধারা। হৃদয়-পাত্র উজাড় করে যা দিলে, তাকে গ্রহণ করবো আমি কি দিয়ে! অঞ্জলিভরে যা নিলাম, তাকে রাখি এমন পাত্র কোথায়?

তোমায় তো বলেছি, মিনু, নেবো বললেই কি সব জিনিস নেওয়া যায়? তার জন্যে সাধনা চাই। সে সাধনা আমি কোনোদিন করিনি। তাই, যে-কথা বারংবার বলেছি, যাবার আগে আর একবার বলে যাই—তুমি যা অকাতরে দিয়েছ, তাকে গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই, তার মর্যাদা দেবার যোগ্যতাও আমি অর্জন করিনি। যা আমার প্রাপ্য নয়, অনায়াসে পেয়েছি বলেই, তার উপর লোভ করা চলে না। এইখানেই তার শেষ হোক, এই কামনা জানিয়ে গেলাম।

কাল আমি যাচ্ছি।'

ইতি—সঞ্জয়

পুনশ্চ—চিঠিখানা তোমার হাতে দেবার আগে মিস্টার চৌধুরীকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করেছিলাম। সম্ভবতঃ সেটা তিনি করবেন না। তোমার পড়া হলে এটা তাঁকে দিও।

—স।

চিঠি শেষ হ'ল। মিনুর তখনো দেখা নেই। অগত্যা আর একবার পড়লাম। ততক্ষণেও সে এল না। পাশের ঘরটা ওর পড়বার ঘর। সেখান

থেকে যেন একটা চাপা কান্নার সুর কানে এল। কে কাঁদে? মাঝখানের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। আমার ঠিক সামনে টেবিলের উপর মাথা রেখে লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। একরাশ এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, ঢেকে গেছে সমস্ত টেবিলখানা। রুদ্ধ কান্নার দুর্বার উচ্ছ্বাসে দুলে দুলে উঠছে তার দেহ। চিঠিখানা আর ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে এলাম।

## ॥ তিন ॥

দেড়গজি ফর্দটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে 'বুঝিয়া পাইলাম' বলে সই করে দিলাম। তিনদিন ধরে অবিরাম চলেছে এই চার্জ আদান প্রদান পর্ব। দাতা—প্রাজ্ঞ এবং সিনিয়র জেলর রায়সাহেব বনমালী সরকার। গ্রহীতা- তাঁর এই অজ্ঞ এবং অ্যাক্‌টিনি জুনিয়র, বাবু মলয় চৌধুরী। শুরু থেকেই উনি আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, 'বেশ করে দেখে শুনে মিলিয়ে নেবেন, মশাই। এর পরে যেন বলে বসবেন না, এটা পাইনি আর ওটা পাইনি।' অতএব এই তিনদিন ধরে দেখছি শুনছি এবং মেলাচ্ছি। ঘানিঘরের কয়েদি থেকে রসদগুদামের বস্তা, ডেইরির ষাঁড় থেকে পোলট্রির আণ্ডা। আলাদা ইনচার্জ আছেন প্রতি বিভাগে। নিজ নিজ এলাকাভুক্ত সবকিছুর জন্য তাঁরা দায়ী। কিন্তু তার দ্বারা এই বিশাল কারাসম্পত্তির ওপর জেলরের যে সর্বময় দায়িত্ব, তার খণ্ডণ হয় না। সুতরাং ওজন কর পেঁয়াজ আর পাঁচফোড়ণ, গুনে নাও রসুইখানার খুন্তি আর গোসলখানার মগ।

ফর্দের একটা নকল পকেটস্থ করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রায়সাহেব—'ওঃ—হো! আসল বস্তুটাই তো আপনাকে বোঝানো হয়নি।'—বলে হাঁক দিলেন, 'রতিকান্ত!' আফিসের পেছন দিকে একটা ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক কৃষ্ণমূর্তি। ছায়ামূর্তি বললেই চলে। হাড়ের ফ্রেমের ওপর চামড়ার খোলসটা জড়াবার আগে মাঝখানে যে একটা মাংসের প্লাস্টার দিয়ে নেওয়া দরকার, সে কথা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন ওর বিধাতাপুরুষ। সে অভাব পূরণ করেছে পিঠের উপর একটা মস্ত বড় কুঁজ। ঝুঁকে পড়া দেহটাকে আরো খানিক নুইয়ে ডবল প্রণাম ঠুকল রতিকান্ত। তারপর যুক্ত-করে দাঁড়িয়ে রইল হুকুমের অপেক্ষায়। রায়সাহেব বললেন, 'এটি আপনার খাস্।

বয়, বেয়ারা, বাহন একাধারে সব। টেবিল ঝাড়বে, ফাইল গোছাবে, এটা ওটা এগিয়ে দেবে। কাজের লোক, তবে কাজটা মাঝে মাঝে একটু বেশী করে ফেলে। যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া দরকার, সেটা তাকে তুলে রাখে, আর কালো কালির দোয়াতে ঢেলে দেয় লাল কালি।'

প্রশংসা শুনে রতিকান্তর মুখের ওপর একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বললাম, 'তোমার নামটি তো বেশ।'

হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হ'ল। বিগলিত কণ্ঠে বলল রতিকান্ত, 'আজ্ঞে, ওটা আমার গুরুদেবের দেওয়া। আগের নাম ছিল ভজহরি।'

গুরুদেবের রসজ্ঞানের তারিফ করে বললাম, 'বেশ, বেশ, তারপর, জেল হ'ল কিসের জন্য?'

—৩৭৯, আর কি? উত্তর করলেন রায়সাহেব। রতিকান্তের মাথাটা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে। প্রশ্ন করলাম, 'কী চুরি করেছিলে?'

মৃদু কণ্ঠের কুণ্ঠিত উত্তর—'গরু।'

জেলের অধিবাসী যারা, তাদেরও একটা সমাজ আছে। তার বিভিন্ন স্তর। স্তরভেদের মাপকাঠি হ'ল ক্রাইম্ অর্থাৎ কৃত অপরাধের জাতি এবং গুরুত্ব। কুলীন-পাড়ায় থাকেন খুন, তহবিল তছরূপ, Criminal breach of trust কিংবা 'স্বদেশী' ডাকাতি। চুরির স্তর তার অনেক নীচে। সবার নীচে, সবার শেষে সবহারাদের মাঝে যার বাস, তার নাম গরুচোর। শুধু হরিজন নয়, অভাজন। চোর হলেও এরা চোর জাতির কলঙ্ক। স্বজাতির আসরেও হুঁকাবন্ধ। এই জন্যে জেলে এসে এরা সহজে মুখ খোলে না। আমার এক সহকর্মী ছিলেন। কয়েদি খালাস দেবার সময় নাম ধাম বিবরণ ইত্যাদি মেলাবার পর তিনি সবাইকে একটি প্রশ্ন করতেন—'কী চুরি?' যাদের অপরাধ চুরি নয়, তারা সগর্বে উত্তর দিত, খুন, ডাকাতি কিংবা নারীহরণ। যারা চুরি সেকশনে দণ্ডিত, তারাও বলত, টাকা চুরি, কাঁঠাল চুরি, কিংবা অন্য কিছু। একবার এমনি এক ৩৭৯ কিছুই বলতে চায় না। জেলর সাহেব নাছোরবান্দা। টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন, 'কী চুরি?'

—আজ্ঞে, গরুর বিষয়ে।

রতিকান্তকে দেখলাম একটি বিরল ব্যতিক্রম। জেলে ঢুকবার কয়েক দিনের মধ্যেই তার কীর্তিটুকু বন্ধু-সমাজে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বলেছিল, 'যাই বল ভাই, তোমাদের ঐ টাকাকড়ি বাক্স প্যাঁটরার চেয়ে আমার

এই চারপাওয়ালা মাল পাচার করা অনেক সোজা। তাছাড়া ঝামেলাও কত কম! সি'দ কাটা নেই, তালাভাঙা নেই; গেরস্তের ঘরে ঢ়ুকে প্রাণটি হাতে করে ইষ্টনাম জপ করা নেই। সোজা গোয়ালে গিয়ে, দড়িটা খোল, তারপর হাঁটা দাও। রাতটা কোনরকমে কাবার হ'লে আর তোমাকে পায় কে? ধরা পড়ার কথা বলছ? ও সব কপালের লেখা। শাস্তরে বলেছে দশদিন চোরের, একদিন গেরস্তের।'

এহেন অকপট স্বীকারোক্তির পর গাঁজা, বিড়ি কিংবা 'দশ পঁচিশে'র গোপন আড্ডায় রতিকান্তের ঠাঁই পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। সে গল্প শুনলাম রায়সাহেবের মুখে। এক রবিবার উনি ফাইল দেখছেন। একজন মাতব্বর গোছের কয়েদি সেলাম জানাল, 'নালিশ আছে, হুজুর।'

—কি নালিশ?

—আমাকে ১৩ নম্বর থেকে আর কোথাও সরিয়ে দেবার হুকুম দিন।

—কেন?

—বড্ড চোর ছ্যাঁচড়ের আড্ডা,—বলে আড়চোখে তাকাল রতিকান্তের দিকে। রায়সাহেব তার টিকেট লক্ষ্য করলেন, ৩৮১ ধাবা। বললেন, 'তুমি কি কবে-ছিলে?'

—আজ্ঞে, মনিব মাইনে দেয়নি বলে ঘড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

—ও-ও। সেটা বুঝি চুরি নয়?

—চুরি হতে পারে স্যার, কিন্তু গরু চুরি নয়।

জেলর সাহেব এই ঘড়ি-নিয়ে-প্রস্থানকারীর নালিশ মঞ্জুর করেননি। যদিও বুঝেছিলেন তাব নালিশটা নেহাত লঘু নয়, এবং তাব পেছনে রয়েছে 'জনমতের' সমর্থন। কয়েকদিন পরেই সেটা স্পষ্ট হ'ল, এবং রতিকান্ত নালিশ জানাল, তাকে অন্য জেলে চালান দেওয়া হউক। বেচারার বেগতিক অবস্থা বিবেচনা করে রায়সাহেব তাকে জেলরের খাস্-ফালতুর ছাপ দিয়ে নিয়ে এলেন নিজের আফিসে এবং রাতে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন 'সেল' ব্লকে।

চার্জ নেবার তিন চার দিন পর। বিকেল বেলা আফিসের টেবিলে বসে কাজ করছি। পায়ের উপর ঠান্ডা একটা কি ঠেকতেই ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম। সাপ টাপ নয় তো? টেবিলের নীচে থেকে সকুণ্ঠ সাড়া এল, 'আমি রতিকান্ত, হুজুর।'

—ওখানে কি করছিস, হতভাগা?

—আজ্ঞে একটু পদসেবা—। ও হুজুরের করতে হ'ত কিনা রোজই—।

—থাক্, এ হুজুরের করতে হবে না। দয়া করে বেরিয়ে এস।

রতিকান্ত বিস্মিত হ'ল। এ বিস্ময় লক্ষ্য করেছি আমার সহকর্মী মহলেও। শুধু বিস্ময় নয়, স্থান বিশেষে বিদ্রূপ, নব্যতন্ত্রের 'লোক দেখানো উদারতা'র উপর কটাক্ষ। বৈকালিক আফিস ঠিক আফিস নয় জেলবাবুদের। দেহে নেই ইউনিফর্মের নাগপাশ, মনে নেই ব্যস্ততার বোঝা। অর্ধনিমিলিত নেত্রে আরামকেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বিশ্বস্ত কয়েদির হাতের নিপুণ চরণদলন কিংবা পক্ক কেশ উত্তোলন, তখনকার দিনে এই ছিল সিনিয়র অফিসর-দের নিত্য বরাদ্দ। আমরা সে রসে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। হায়রে কবে কেটে-গেছে পদসেবার কাল!

কিছুদিন আগে রতিকান্তের অর্ধ মেয়াদ শেষ হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখি, টিকেটখানা হাতে করে আমার সামনে বিনা কারণে ঘুরে যায়। একদিন বললাম, 'কিরে রতিকান্ত, কিছু বলবি?'

মাথা নীচু করে দুচারবার ঢোক গিলে বহু সংকোচে জানাল, 'বড় ডিপ্‌টি বাবুকে টিকিট দেখিয়েছিলাম। বললেন, 'মেট'এর হক্ হয়েছে।'

কয়েদি জীবনে 'মেট' পদলাভ বহু আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। বললাম, 'মেট হতে চাস?'

জবাব দিল না। শীর্ণ মুখখানা শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—তোর এই চেহারা! কয়েদিরা তোকে মানবে কেন?

—মানবে না কোন্—? হঠাৎ উত্তেজনায় একটা শকারাদি শব্দ উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল। দাঁতে জিব কেটে থেমে গেল।

রতিকান্তকে মেট পদে প্রমোশন দেওয়া গেল। ডেপুটি জেলর বিনয়-বাবু বললেন, 'আপনার রতিকান্তর কুঁজ বোধহয় আর রইল না, স্যর।'

—কি রকম?

—মেট হবার পর সে রীতিমত বুক টান করে হাঁটবার চেষ্টা করছে।

সেটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম। দেখলাম, বেল্ট্‌টা খালি-কোমরে ঢল ঢল করে বলে গামছা জড়িয়ে তার ওপর বেল্ট্ এঁটেছে। নিত্য পালিশের ফলে চক্ চক্ করছে তার পিতলের চাপরাস।

জেলের বাইরে যে সব কয়েদি কাজ করে, তাদের প্রত্যেকটা গ্যাঙ্ বা দফার জন্যে অন্ততঃ একজন করে 'মেট' চাই। বাইরে যাবার অধিকার সকলের নেই।

যেতে পারে শুধু তারাই, যাদের বাকী দণ্ডকাল একবছর অথবা তার কম। বড় বড় জেলে, যেখানে স্বল্প-মেয়াদী লোকের সংখ্যা বেশী নয়, বাইরে যাবার যোগ্য মেট মাঝে মাঝে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। একদিন দেখা গেল জেলরের 'কুঠিতে' যে সব কয়েদি বাগানে এবং 'জলভরি'র কাজ করে, তাদের মেট নেই। সবগুলো মেট-এর টিকেট পরীক্ষা করে বড় জমাদার এসে জানাল, বাইরে যাবার হক্ আছে শুধু একজনের।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সে?'

—আপ্‌কা রোতিকান্ত।

রতিকান্তের দিকে তাকালাম। আফিসের কোণে বসে সে আমার স্যাম্-ব্রাউন বেল্টে পালিশ লাগাচ্ছিল। একটিবার চোখ তুলেই হঠাৎ দ্বিগুণ বেগে বুরুশ চালনা শুরু করল। বললাম, 'কিরে, পারবি?'

উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলল, 'হুজুরের দয়া।'

'মেট'-এর চেহারা দেখে গৃহিণী তো হেসেই খুন। বললেন, 'এ ঘিয়ে ভাজা কুঁজো দিয়ে কাজ চলবে না, বাপু।' আমি বললাম, 'রসে ভেজা যদ্দিন না পাচ্ছ, ঘিয়ে ভাজা দিয়েই চালিয়ে নাও।'

—কী যে বল? ঐ কুঁজ নিয়ে পাহারা দেবে কি গো? সব কয়েদি পালিয়ে যাবে।

বললাম, 'সে ভয় নেই। পালাতে গেলেই কুঁজে আটকে যাবে।'

আমার একটি নিজস্ব ফুলের বাগান ছিল। তার ভার পড়েছিল ব্যক্তিগত ভাবে মেটের উপর। আগে যে ছিল, সে নিজে হাতে সব কাজ করত। তাই শুনে রতিকান্তও লেগে গেল কোদাল সাবল খুরপি নিয়ে। একদিন দেখলাম, তার কোদাল-চালান কসরৎ দেখে বাগানের পাশে ভিড় জমে গেছে। সিপাই বেটন দেখিয়ে থামাতে পারছে না। জটলার আড়ালে তার দু-একটি কয়েদি পাছে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়, এই ভয়েই সে সন্ত্রস্ত। বেগতিক দেখে বাগান পরিচর্যার দায় থেকে রতিকান্তকে রেহাই দিতে হ'ল। গৃহিণীকে ডেকে বললাম, 'ওর আর বাগানে গিয়ে দরকার নেই, বাড়ির ভেতরেই করুক যাহোক কিছু।'

—হ্যাঁ, করবার তো ওর কতই আছে! শ্লেষের সঙ্গে বললেন গিন্নী, 'বারান্দায় বসে রাস্তার লোক গুনুক না। অনেক উপকার হবে।'

বারান্দাতেই আশ্রয় নিল রতিকান্ত, এবং সেই সুযোগে আমার সাত

বছরের কন্যা মঞ্জু ওকে দখল করে বসল। মায়ের সংসারে অকেজো হলেও মেয়ের সংসারের কাজে অকাজে তার আর ফুরসত রইল না।

মাসখানেক বাদে যোগ্য মেট একটা জুটে যেতেই রতিকান্তকে আসতে হ'ল আবার সেই আফিস-ফালতুর কাজে। কিন্তু যে গিয়েছিল সে আর ফিরে এল না। আফিসের সেই ছোট্ট কোণটি তার হারিয়ে গেছে। আগের মত সেইখানে এসেই সে বসল, নিজেকে বাঁধতে চাইল পুরানো দিনের সব কিছুর সংগে। কিন্তু কোথায়, কি করে যেন ছিঁড়ে গেছে একটা তার; কিংবা মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে কোনো নতুন বাঁধনের সূত্র। তাই কথায় কথায় তার ত্রুটি, পদে পদে তার ভুল। টেবিলের একটা দিক ঝাড়া হয় তো, আর এক দিকে ধুলো লেগে থাকে। কুঁজোয় জল ভরা হয় না। সন্ধ্যাবেলা ধুনো দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। একদিন বলল, 'শরীরটা ভাল ঠেকছে না, বাবা। একটু হাঁসপাতালে যেতে চাই।' টিকিটে লিখে দিলাম হাঁসপাতালে যাবার নির্দেশ। দুদিন পরে ফিরে এসে বলল, 'ভাল লাগল না।' ডাক্তারকে বলে একটু দুধের ব্যবস্থা করে দিলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেটাও সে নিয়মিত আনতে ভুলে যায়। কদিন পরে দেখি সাপ্তাহিক ফাইলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁহাতে টিকেট, ডান হাত ঝুলছে দেহের পাশ দিয়ে।

– কি চাই ?

—একখানা চিঠি দিন, হুজুর। মেয়েটার খবর পাচ্ছি না অনেক দিন।

রতিকান্তের ঘর সংসারের বালাই নেই, এইটাই জানা ছিল। এই প্রথম শুনলাম, তার একটি মেয়ে আছে। সাত আট বছরের। মামাদের কাছে থাকে। টিকিটের পাতা উল্টে দেখলাম, চিঠিপত্রের আদান বা প্রদান, কোনটারই কোনো চিহ্ন নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ের খবর দেয় না তারা ?'

—কই দেয় ?

—তুই নিসনি কেন এতদিন ?

কোন উত্তর নেই। লিখে দিলাম চিঠি লিখবার অনুমতি।

ছমাস এবং তার বেশী সাজা নিয়ে যারা জেলে আসে, মাসে মাসে তারা খানিকটা করে মাপ পায়, যার নাম 'রেমিশন'। ওরা বলে 'মার্কা'। মার্কার পরিমাণ নির্ভর করে প্রার্থীর কাজ এবং চালচলনের উপর। এর জন্যে আবেদন নিবেদনের অন্ত নেই। সকলেই চায় যতটা সম্ভব বেশী মার্কা পেয়ে খালাসের দিনটা যতখানি এগিয়ে আনা যায়। রতিকান্ত খোদ জেলরের আফিস মেট।

মার্কা লাভের সুযোগ এবং সুবিধা তার সব চেয়ে বেশি। • এ জন্যে কয়েদি মহলে সে সার্বজনীন ঈর্ষার পাত্র। কিন্তু এ সুবিধার সৎ বা অসৎ ব্যবহার সে কোনদিন করেনি। সপ্তাহান্তে প্যারেড্ দেখতে গিয়ে মার্কার আবেদন শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রতিকান্ত সেখানে অনুপস্থিত।

সেদিন আফিসে গিয়ে বসতেই টেবিলের উপর চোখে পড়ল রতিকান্তের টিকেট। বললাম, 'এটা এখানে কেন ?' রতিকান্ত যথারীতি নিরুত্তর।

—কি চাই, বল্না ?

—কটা দিন বকশিশ্ দেবেন, হুজুর।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলাম ওর দিকে। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল রতিকান্ত, 'মেয়েটাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় ছট্ফট্ করছে।'

পুরো 'মার্কা' পেয়ে দিন পনর পরে রতিকান্তের খালাসের দিন স্থির হয়ে গেল।

একদিন আফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি, তুমুল কাণ্ড। মঞ্জুর দোল খাওয়া মেমসাহেবটি নিরুদ্দেশ। মেয়ে কেঁদে বাড়ি মাথায় করেছে, আর তার মা যে-ভাবে পা ফেলে বেড়াচ্ছেন বাড়িটা যে-কোন মুহূর্তে আমাদের মাথায় পড়তে পারে। শুনে, আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। সুন্দর পুতুলটি। একটা স্প্রিং লাগানো ছোট্ট চেয়ারে ফুটফুটে একটি মেম বসে। চাবি ঘোরালেই সবসুদ্ধ দোল খেতে থাকবেন, আর তার সঙ্গে দুলিয়ে দেবেন শিশু-দর্শকদের সমস্ত হৃদয়। মঞ্জুর শোকটা যে কত তীব্র, অনুভব করতে চেষ্টা করলাম। বাড়িতে একদল কয়েদি। স্বাভাবিক নিয়মে চুরির সন্দেহ তাদের উপরেই পড়বে। বড় জমাদার যথারীতি সবাইকেই কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিলেন। কিন্তু মেমসাহেব উদ্ধার হ'ল না। মঞ্জুর মা বললেন, 'এ নিশ্চয়ই সেই কুঁজোটার কাণ্ড।'

আমি মৃদু প্রতিবাদ জানালাম, 'তা কেমন করে সম্ভব ? সে তো ছিল সেই কতদিন আগে !'

—হ্যাঁ। সেই তখনই সরিয়ে ফেলেছে। মেয়ের কি খেয়াল ছিল নাকি এ্যাদ্দিন ? আজ হঠাৎ খোঁজ পড়েছে, আর নাকে কান্না শুরু হয়েছে।—বলে গৃহিণী এক মোক্ষম ধমক লাগালেন মেয়েকে। ফলে নাকে কান্নার পর্দা চড়ে গেল, এবং তার মধ্যেই শোনা গেল তার প্রতিবাদ, কখ্খনো না। কুঁজো মোটে খুব ভালো। সে কখ্খনো আমার মেম্সাহেব নেয়নি।

অগত্যা সন্দেহজনক দুজন কয়েদি এবং সেই সঙ্গে বর্তমান মেটটিকেও দল থেকে সরিয়ে অন্য কাজে দেওয়া হল।

নির্ধারিত দিনে সকাল আটটায় রতিকান্ত খালাস হয়ে গেল। তাকে দেওয়া হ'ল একদিনের খোরাকি ছ'আনা, তার গন্তব্য স্টেশনের একখানা রেলের পাস, আর ভাল কাজ দেখানোর বকশিশ্ দু'টাকা। যাবার সময় ভিড়ের মধ্যে নজরে পড়ল তার সেই পেটেন্ট প্রণাম, হাতে কাপড়-চোপড়ের একটা ছোট্ট পুঁটলি।

বেলা তখন নটা। আফিসের পুরো মরসুম। নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। গেটের বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। আমার নতুন মেটটা এসে জানাল, 'রতিকান্তকে ধরে এনেছে সিপাইরা।'

—কেন!

—চোরাই মাল পাওয়া গেছে ওর পুঁটলির মধ্যে।

আফিস থেকে বেরিয়ে দেখলাম, জেল ফটকের সামনে ভিড় জমে গেছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুঁজো রতিকান্ত। একজন পালোয়ান সিপাই শক্ত করে ধরে রয়েছে তার একটা হাত। আমাকে দেখে একবার মুখ তুলে তাকাল। চোখে পড়ল, কপালের পাশে খানিকটা জায়গা ফুলে উঠেছে। গালের উপর কালশিরে দাগ। পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বড় জমাদার। ডান হাতে বেটন, বাঁহাতে একটা পুতুল। বীরদর্পে এগিয়ে এসে বিজয় উল্লাসে জানাল, 'উস্‌কো গাঁট্‌রিসে নিকালা—খোকী বাবাকা মেম্‌সাব্।'

পুরোপুরি ব্যাপারটা শোনা গেল সেই পালোয়ান সিপাইএর কাছে। গেট থেকে বেরিয়ে রতিকান্ত যখন রাস্তার দিকে না গিয়ে আমার বাগানের দিকে যাচ্ছিল, তখনই তার কেমন সন্দেহ হয় এবং লুকিয়ে তার অনুসরণ করতে থাকে। তারপর বাগানের ধারে একটা গাছের গোড়ার মাটি সরিয়ে এই জিনিসটা বের করে যেমনি পুঁটলির মধ্যে ভরা, সিপাই ছুটে গিয়ে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে।

আমার সহকর্মী বিনয়বাবু মন্তব্য করলেন, 'আমি আগেই বলেছি স্যার, ব্যাটার ঐ কুঁজ হচ্ছে আসলে একটা শয়তানির বস্তা। ওকে ভালরকম শায়েস্তা করা দরকার।' সে বিষয়ে কারো ভিন্ন মত আছে বলে মনে হ'ল না। অপেক্ষা শুধু আমার হুকুমের। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। সামনের লোকজন ঠেলে বেরিয়ে এল আমার কন্যা মঞ্জু। বড় বড় চোখ করে একবার

তাকিয়ে দেখল সবদিকটা। তারপর ছুটে গিয়ে বড় জমাদারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল তার মেমসাহেব। রতিকান্তের হাতের মধ্যে সেটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'টুনীকে দিও। বলো, মঞ্জু দিয়েছে। অ্যাঁ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে, আর কোন দিকে না চেয়ে ছুটে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

রতিকান্তের মুখে এতক্ষণ কোন বিকার ছিল না। চোখ দুটোও ছিল শুষ্ক। এবার তার সেই কুৎসিত শুকনো তোবড়ানো গাল দুটো কুঁচকে কেঁপে উঠল। তারই সঙ্গে দুচোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল জলের ধারা।

## ॥ চার ॥

পুলিস আর জেল সমগোত্র হলেও সমধর্মী নয়। লক্ষ্য হয়তো এক, কিন্তু কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। ওরা ঘাটেন কাচামাল, আমাদের গুদামে থাকে তৈরি জিনিস। ওদের ভাগে raw materials, আমাদের finished products. পুলিসের কাজ হচ্ছে মাল সংগ্রহ করা, নানা জায়গা থেকে নানা রকম মাল। তাকে ঝেড়ে পিটিয়ে চালান করেন কোর্ট্ নামক ফ্যাক্টারিতে। তারপর সেই বকযন্ত্রে শোধন করে finishing ছাপ দিয়ে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসেন জেলের দরজায়। আমরা মাল খালাস করি, সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরে তুলি, কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। তারপর পুরানো হয়ে গেলে ফেলে দিই রাস্তায়। সেখানে কতগুলো পচে, কতগুলো হারিয়ে যায়, কতগুলো আবার ঘুরে ফিরে পুলিসের গাড়ি চড়ে ফিরে আসে আমাদের গুদামে। পুলিসের সঙ্গে এই হ'ল আমাদের সম্পর্ক। ওদের যেখানে সারা, আমাদের সেখানে শুরু।

এমনি করে একদিন একটা বড় রকম পুলিস-অভিযানের জের টানবার জন্যে আমার বদলি হ'ল এক মস্ত বড় সেন্ট্রাল জেলে। দাঙ্গা হয়ে গেছে তিরিশখানা গ্রাম জুড়ে। পাইকারী ভাবে চলেছে খুন, জখম, লুণ্ঠন, আগুন আর নারীমেধ যজ্ঞ। সব শেষ হবার পর যথারীতি পুলিসের আগমন। গোটা কয়েক অনাবশ্যক গুলিবর্ষণ। তারপর ভরে গেল জেলখানা। গিয়ে দেখলাম "লক্-আপ টোটাল" কয়েক শ' থেকে একলাফে ছাড়িয়ে গেছে দু-হাজার। রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। সকালে যাই, বাড়ি ফিরি বেলা দেড়টায়। আবার বিকালে যাই, ফিরে আসি রাত দশটায়। বাকী রাত যেটুকু, তারো ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির দরজায় এসে হুঙ্কার দেয় গেট-ফালতু, 'এক লরি আসামী আয়া, হুজুর।' কিংবা হয়তো রিপোর্ট দেয় কোনো জমা-

দার, 'বারো নম্বরমে একঠো মর্ গিয়া।'

অতিরিক্ত আফিস বসেছে কাপড়ের গুদামে। কম্বলের গাঁট হটিয়ে পড়েছে চেয়ার টেবিল। একটা ছোট কামরায় ঠাসাঠাসি আমরা তিনজন অফিসার। মাঝখানে জাঁকিয়ে বসেন আমাদের সিনিয়র ফৈজুদ্দিন সাহেব। দু-পাশে আমরা দুজন জুনিয়র। কাগজপত্রের স্তূপ যা-কিছু আমাদের দিকে; দাদার সামনেটা ফাঁকা। উনি হন্তদন্ত হয়ে আসেন। দু-চারটে হাঁক ডাক দিয়ে লাঠিখানা নিয়ে ঢুকে পড়েন জেলের মধ্যে। কয়েক ঘণ্টা পরে ব্যস্ত হয়ে ফেরেন। 'কোথায় গিয়েছিলেন দাদা?' 'একজিকিউটিভ্ করে এলাম খানিকটা। তোমাদের মত কলম হাতে করে আড্ডা দিলে কি আর জেল চলে?'

দু-চারদিনেই জানা গেল দাদার 'একজিকিউটিভ্'-এর এলাকা হ'ল রসদ-গুদাম কিংবা হাঁসপাতাল। কর্মতালিকা—চা এবং সিগারেট যোগে খোসগল্প কিংবা টাটকা সিরাপের শরবত-পান। তখন আমরাও মাঝে মাঝে 'একজিকিউ-টিভ্' শুরু করলাম, এবং দাদার সামনে কিছু কিছু ফাইল জমতে শুরু হ'ল। একদিন এমনি একটা ফাইল খুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'এ কি! লুনাটিক্ ফাইল আমার টেবিলে কেন? পাগল টাগল সব তুমি।'

বললাম, 'আমি পাগল! তা, আপত্তি নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রেই পাগল।'

রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। উনি খানিকক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আহা, তোমাকে পাগল বলবো কেন? বলছিলাম, পাগলের ফাইল তুমি ডিল করবে। ওটা জুনিয়রের কাজ।'—বলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন বাণ্ডিলটা।

প্রতি জেলকেই একদল পাগল পুষতে হয়। তাদের ক্রিয়া-কলাপ যেমন বিচিত্র, আইন-কানুনের মারপ্যাঁচগুলোও তেমনি জটিল। পাগলের আবার শ্রেণীভেদ আছে। যে-কোনো জেলের সেল্-ব্লকে গেলে দেখতে পাবেন, ছোট ছোট কতগুলো সাইন-বোর্ড ঝুলছে—Non-criminal lunatic. অর্থাৎ যাকে crime বলে, সে-রকম কোনো অপরাধ তারা করেনি। করেছিল শুধু পাগলামি, এবং সেইটাই তাদের জেলে আসবার কারণ। আমি কোনোদিন ভেবে পাইনি, এই কারণটা কি আমার আপনার সবার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়? সংসারে Non-criminal lunatic নয় কে? তবে, বলতে পারেন, সবাইকে

তো আর জেলে জায়গা দেওয়া যায় না। তাই পুলিস যেখান সেখান থেকে দু-চারটা স্যামপ্‌ল্‌ সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয় জেলখানায়। সেখানে একবার যারা ঢোকে, তাদের আর নিস্তার নেই। এই সেল্‌-এ বসে বসেই একদিন বদ্ধ পাগল হয়ে তারা রাঁচীর রাস্তা ধরে।

আর একরকম পাগল আছে। তাদের নাম criminal lunatic. অর্থাৎ শুধু lunatic নয়, তার সঙ্গে আবার criminal. পাগলামি ছাড়াও তাদের নামে আছে একটা কোনো আইন-ভঙ্গের অভিযোগ, ঝুলে আছে Penal Code-এর কোনো ধারা। এদের আবার দুটো দল। কেউ আগে পাগল, পরে criminal; কেউবা আগে criminal পরে পাগল।

ফৈজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'কেসটা আমি মোটামুটি দেখেছি। খুন করেছিল মেয়েটা। দ্যাখ তো কোন্‌ সেক্‌শনে কমিট্‌ করেছে? ৪৭১ না ৪৬৬?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম, 'ওটা কী বলছেন দাদা? Greek?'

—আহা, বুঝতে পারছ না! পাগল খুনী না খুনী পাগল?

হতাস সুরে বললাম, 'নাঃ; গ্রীক্‌ নয়, হিব্রু।'

দাদা কাজের লোক। ঠাট্টা তামাসা পছন্দ করেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন, 'কাজকর্ম তো আর শিখতে আসনি? খালি ফাঁকি আর ফক্‌কড়ি। পড় পড়, ভালো করে পড়ে দ্যাখ।'—বলে উনি লাঠিখানা তুলে নিয়ে যথারীতি একজিকিউটিভ্‌ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

ফাইল খুলে প্রথমেই নজরে পড়ল, আসামীর নাম। মল্লিকা গাঙ্গুলী। বেশ নামটি তো? মনে মনে পড়লাম কয়েকবার। চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। দীর্ঘাঙ্গী তরুণী। মাথায় বিপর্যস্ত কেশভার; চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি; মুখখানা দিনশেষের মল্লিকা ফুলের মত শুভ্র-মলিন। খুন করেছিল কেন? হয়তো খুলতে পারেনি জীবনের কোনো জটিল গ্রন্থি, মেটাতে পারেনি অন্তরের কোনো গভীর দ্বন্দ্ব। তাই। মনটা উদাস হয়ে উঠল। কোন্‌ এক অ-দৃষ্টা অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর বিধ্বস্ত জীবনের সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করলাম।

তথ্য যেটুকু পেলাম অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং অতিমাত্রায় সরল। তার মধ্যে ফৈজুদ্দিন সাহেবের প্রশ্নের উত্তর হয়তো ছিল। কিন্তু উত্তর পায়নি বৃদ্ধা পৃথিবীর সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—মানুষ খুন করে কেন? কী সেই

দুর্জ্ঞেয় প্রবৃত্তি, যার তাড়নায় তার বুকে জাগে নর-রক্তৃষা, চোখের পলকে অসাড় হয়ে যায় তার অনন্ত কালের মানব ধর্ম—দয়া মায়া, স্নেহ প্রেম; হাজার বছরের সংস্কৃতি দিয়ে গড়া যে সভ্য মানুষ, তাকে এক নিমেষে করে তোলে নখী দন্তী শৃঙ্গী?

আইন যে-টুকু দেখে, যে-টুকু দেখে তার বিচার করে সে শুধু তার বাইরের রূপ, তার কাজ, তার হাত পায়ের অভিব্যক্তি,—তুমি এই করেছ, এই করনি। এই করা এবং না করার অন্তরালে তার যে চিররহস্যাবৃত অন্তর্লোক, সেখানে বিচারকের দৃষ্টি পেঁছায় না।

নথিপত্র থেকে পাওয়া গেল, মল্লিকা খুন করেছিল। তারপর পুলিসের হাতে যখন গিয়ে পেঁছল, তখন সে আর প্রকৃতিস্থ নয়। বিকৃত মস্তিষ্কের বিচার চলে না। অভিযোগের মর্ম সে বুঝবে না। তার বিরুদ্ধে নিজেকে সমর্থন করবার যে মনন-শক্তি, সেটাও তার নেই। সিভিল-সার্জনের মতে, she is not fit to stand her trial. তাই মামলার শুনানি স্থগিত রেখেছেন জজসাহেব। এই বিকৃতি যদি কোনোদিন কেটে যায়, ফিরে আসে তার মানসিক সাম্য, সেদিন আবার তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বিচারশালায়, গ্রহণ করতে হবে তার প্রাপ্য দণ্ড। তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক করে তুলবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সে দায়িত্বও সরকারের। তাই জজসাহেব মামলা স্থগিত রেখেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, সেই সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন তার উপযুক্ত চিকিৎসার। মল্লিকার গন্তব্য-স্থল রাঁচী উন্মাদাশ্রম। সেখানে যতদিন তার স্থান নির্দিষ্ট না হয়, তাকে জেলে থাকতে হবে। রাঁচীর পথে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তার এই কারাবাস।

গত ছ-মাস ধরে মল্লিকার দিন কেটেছে কলকাতার কোনো বড় জেলে, জেনানা-ফাটকের একটা ছোট নির্জন কামরায়। সেখানকার যা কিছু, সবারই উপরে ছিল তার নীরব ঔদাসীন্য। কাউকে সে কোনো প্রশ্ন করেনি, কারো কোনো প্রশ্নের জবাবও দেয়নি। সঙ্গিনীদের কাউকে সে চিনত না। তাদের বিরাগ এবং অনুরাগ উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সে সমজ্ঞান। তারপর একদিন একটি নতুন মেয়ে ভর্তি হ'ল। কোলে তার দু-তিন মাসের শিশু। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা গিয়েছিল নাইতে কিংবা খেতে। ফিরে এসে দেখে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাগলী। সর্বনাশ! মেয়েটির চিৎকার শুনে ছুটে এল সবাই। শিশুটিকে যখন কেড়ে নিল ওর

কোল থেকে, মল্লিকা শুধু তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে, তারপর নিঃশব্দে উঠে গেল তার সেই ছোট্ট সেলটিতে। মা নালিস জানাল জেলর সাহেবের কাছে। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হলেন। মল্লিকার জন্যে নিযুক্ত হ'ল স্পেশাল গার্ড। তার সেল-এর দরজা বন্ধ রইল উদয়াস্ত। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে শেষটায় তাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন আমাদের জেলে। এখানে মেয়েদের ওয়ার্ডে বাচ্চা ছেলে নেই।

কদিনের মধ্যেই সে এসে গেল। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে যখন নামানো হ'ল জেল-গেটের সামনে, একবার তাকিয়ে দেখলাম, চারদিকে যারা ছিল, সব যেন পাথর হয়ে গেছে। দেখলাম, আমাদের কল্পনা কত দীন, কত ভীরু! আসল বস্তুর কাছে ঘেঁষতেও সে ভয় পায়। আর দেখলাম, বিধাতার হাতের অনির্বচনীয় সৃষ্টি যে রূপ, মানুষের হাতের অনাদর অবহেলা তাকে কী দুর্গতির মধ্যেই না নিয়ে যেতে পারে! ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের দেশের বাড়ির বৈঠকখানার সামনে ছিল একটা ডালিম গাছ। ফাল্গুনে তার সর্বাঙ্গে ছেয়ে যেত বর্ণোজ্জ্বল ফুলের মেলা। বৈশাখে শাখা পল্লব নুয়ে দিত রস-পুষ্ট ফলের ভার। একবার কোথা থেকে একঝাঁক ভীমরুল এসে তার ডালে বাসা বাঁধল। আমাদের একজন অতি-বিজ্ঞ অভিভাবক ভীমরুল তাড়াবার জন্যে একদিন সেই ফলেফুলে-ভরা ডালিম গাছে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মনে আছে, ইস্কুল থেকে ফিরে সেই পোড়া ডালগুলোর দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলে-ছিলাম। দেশ ছেড়ে আসবার পরেও অনেক দিন যখন তখন তার কথা মনে পড়ত। তারপর ভুলে গিয়েছিলাম। আজ এতকাল পরে মল্লিকা গাঙ্গুলীর দিকে চোখ পড়তেই সেই দগ্ধ-পল্লব ভ্রষ্টশ্রী ডালিমগাছটি আমার চোখের উপর ভেসে উঠল।

আমাদের মেয়ে-ওয়র্ডার মানদা বিশ্বাস মল্লিকার বাহু ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল আমার আফিসে। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন।' সে বসল না। দীর্ঘায়ত নীলাভ চোখদুটি তুলে একবার শুধু তাকাল আমার দিকে। বিস্মিত হলাম। এতো উন্মাদের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নয়। শান্ত সমাহিত দুটি চোখ। তার অন্তরালে যেন লুকিয়ে আছে কতকালের পাথর-চাপা কান্না। সে পাথর যদি সরে যায়, বেরিয়ে আসে অবরুদ্ধ অশ্রুধারা, হয়তো বিশ্ব সংসার ভেসে যাবে।

মানদা তার জামা কাপড় গয়না-গাঁটির নাম বলে যাচ্ছিল, ওয়ারেন্টে যে

তালিকা আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। বাধা দিয়ে বললাম, 'ও সব থাক, তুমি ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

পরের সপ্তাহে Noon Duty-র ভার পড়ল আমার ভাগে। এখানে একটু বলে রাখা দরকার, নুন-ডিউটি ডিউটি নয়, মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম। তার স্থান গৃহ নয়, আফিস— এইটুকু শুধু তফাত। কিন্তু আফিস হ'লেও গৃহ-সুলভ আরাম-ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। 'আমদানি সেরেস্তার' লম্বা টেবিলখানা তক্তাপোশে রূপান্তর লাভ করবে। তার উপর রচিত হবে তাকিয়া এবং সতরঞ্চি সহযোগে পরিপাটি শয্যা। গরমের দিনে মাথার উপর ঘূর্ণ্যমান পাখা। শীতের দিনে সদ্য গাঁটভাঙা কম্বল। ফাঁকা আফিস। চারদিক নিঝুম। নির্বাধ নিদ্রার মনোরম পরিবেশ। কালেভদ্রে কোনো কোনো দিন দু'একটা টেলিফোন্ ঝঙ্কার কিংবা কোর্ট-পুলিসের হুঙ্কার—'আসামী আয়া, হুজুর।' এ সব উৎপাত থাকলেও আমাদের দাদারা এই নুন-ডিউটি নামক বস্তুটিকে মোটামুটি পছন্দ করতেন। কারণ—প্রথমতঃ তিনখানা ঘব আর তার তিনগুণ কাচ্চা-বাচ্চাওয়ালা সরকারী কুঠী দিবানিদ্রার প্রশস্ত স্থান নয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীদের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা কোনো স্ত্রীই প্রসন্ন চোখে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন, ওটা গৃহিণী-জাতিব একচেটে অধিকার। দুপুর বেলা একটু 'গড়িয়ে নেবার' প্রয়োজন যদি কারো থাকে সে তো ওঁদেরই, সংসারের চাকায় যাঁরা ঘুরপাক খাচ্ছেন উদয়াস্ত। আফিস-নামক আড্ডখানায় যারা কাজের নামে ঝিমোয় কিংবা আসর জমায় খোসগল্পের, বাড়িতে এসেও তারা নাক ডাকাবে, এ অন্যায় সইবে কে?

আমি তখনো 'দাদা' পর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি। সঙ্গিনীহীন শয্যায় অভ্যস্ত হতে কিছুটা বিলম্ব ছিল। Noon Duty সপ্তাহটা উৎপীড়ন বলে মনে হত। সেদিনও তাই অপ্রসন্ন মনে সতরঞ্চি-শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছিলাম। জেলগেটের ভেতরদিকের ফটকে তুমুল গণ্ডগোল। পুরুষের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের মিশ্রণ। গিয়ে দেখি খণ্ড-প্রলয়ের সূচনা। একদিকে বিপুল-গুম্ফ গেট-কীপার, আর এক দিকে অনলচক্ষু ফিমেল-ওয়ার্ডার। কি ব্যাপার? গেট-কীপার জবাব দিল না। অঙ্গুলি নির্দেশ করল মানদা বিশ্বাসের উদরের দিকে। চাদরের সযত্ন-আবরণ ভেদ করে সেখানকার বিপুল-স্ফীতি অন্ধ-ব্যক্তিরও নজরে পড়তে বাধ্য। বিস্মিত হলাম। মানদা চিরকুমারী এবং উত্তর-চল্লিশ। তবু বলা যায় না, এ হেন নারীর জীবনেও অকাল বসন্তের আবির্ভাব

ঘটতে পারে। কিন্তু তার এই ফলাফল রাতারাতি দেখা দেবে কেমন করে? সুতরাং গেট-কীপার যদি এ ঘটনার কোনো অনৈসর্গিক কারণ সন্দেহ করে ফিমেল-ওয়ার্ডারকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। মানদাও দমবার পাত্র নয়। নারীজাতির চিরন্তন প্রিভিলেজের উপর দাঁড়িয়ে সেও গেট-কীপারকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। নারীদেহ "তল্লাসি" করবার কী অধিকার আছে পুরুষের? অতএব দূরে রহ।

আমি উভয়-সংকটে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত গেট-কীপারকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করে মানদাকে অনুরোধ করলাম, যদি সম্ভব হয়, সে যেন আমার আফিসে গিয়ে তার দেহভার মুক্ত করে। আপাততঃ সেখানো কোনো পুরুষ উপস্থিত নেই। সে স্বীকৃত হ'ল, এবং কিছুক্ষণ পরে আফিসে ফিরে দেখলাম, আমার টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে একজোড়া শাড়ি, তার পাশে সায়া ব্লাউজ, একশিশি সুগন্ধ তেল, স্নো পাউডার এবং চুল বাঁধবার সরঞ্জাম। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই তার স্বাভাবিক রুক্ষকণ্ঠে বলল মানদা, 'এগুলো তো আর আপনারা দেবেন না। তাই, কপালের ভোগ আমাকেই ভুগতে হয়। এর কোন্‌টা না হলে মেয়েমানুষের চলে, বলুন?'

মেয়েমানুষ ফিমেল ওয়ার্ডে আজ নতুন আসেনি। কিন্তু এতদিন তো এ দুর্ভোগ মানদাকে ভুগতে হয়নি। আজ যে-জন্যে হ'ল সেটাও বুঝলাম। তবু প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু মেয়ে তো তোমার ওখানে গুটি-পনেরো। আর—'

—ও আমার কপাল! একগাল হেসে বলল মানদা। এসব বুঝি ঐ হতচ্ছাড়ীগুলোর জন্যে? ওরা মাখবে স্নো পাউডার!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আচ্ছা স্যার, মল্লিকাকে জেলে পাঠিয়েছে যে হাকিম, আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন তার কাছে?'

—কেন?

—তাকে একবার বলে আসতাম পাগলা-গারদে ও যাবে না, যাবে তুমি। আর বলতাম ওর বাড়ির লোকগুলোকে ধরে এনে ফাঁসি দাও একটা একটা করে। মেয়েটা যে এখনো বেঁচে আছে, সে শুধু যীশুর কৃপায়।

মানদা যুক্তকর কপালে ঠেকাল।

বললাম, 'তুমি শুনেছ ওর সব কথা?'

—কি করে শুনবো? ও তো কথা বলে না। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়েই আমি সব বুঝে নিয়েছি। ক'টা দিন সময় দিন আমাকে। একটু

সুস্থ করে তুলি। তারপর সব জানতে পারবো। যদি পারেন স্যর, ডাক্তার-বাবুকে বলে ওর একটু দুধ-টুধের ব্যবস্থা করে দেবেন।

বললাম, 'করবো। আর, এই কাপড়-চোপড়গুলো এইখানেই থাক। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে।'

দিন পাঁচ-ছয় পরে জেনানা-ওয়ার্ডে যেতে হয়েছিল কোনো কাজে। মানদা বলল, 'মল্লিকাকে দেখবেন না?'

—চল।

সেল্-ব্লকের চত্বরে একটা গাছের নীচে বাঁধানো বেদির উপর বসে আছে মল্লিকা। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্র এসে পড়েছে তার পায়ের কাছটিতে। দেখে চেনাই যায় না। রুক্ষ জট-পাকানো চুল বহু-যত্নে বশে এসেছে। দুটি সুদৃশ্য দীর্ঘ বেণী ঝুলছে পিঠের উপর। পরনে পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়। মুখে সামান্য প্রসাধনের চিহ্ন। কপালে একটি সিন্দুরের টিপ। কালিঢালা দুটি চোখের কোলে সদ্য-লব্ধ স্বাস্থ্যের আভাস। শীর্ণ কপোলে সে-দিন যে মালিন্য দেখেছিলাম, অনেকখানি মিলিয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে লাবণ্যের আভা। সেদিনের মতই নিঃশব্দে একবার চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তেমনি শান্ত দৃষ্টি। মানদা এগিয়ে গিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখখানা আমার দিকে তুলে ধরে বলল, 'এই মেয়ে খুন করেছিল, আপনি বিশ্বাস করেন, ডেপুটিবাবু?' দু'তিনটি মেয়ে-কয়েদী কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজনকে বলল মানদা, 'যা তো সরলা, দিদিমণির দুধ আর ফলের ডিশটা নিয়ে আয়।'

সরলা ছুটল। মানদা আমার দিকে ফিরে বলল, 'দু'একখানা বই-টই দিতে পারেন?'

—বই!

—হ্যাঁ। বাচ্চাদের ছবির বই। দেখছেন না, ও এখন কাঁচছেলের বাড়া। সব কিছু করে দিতে হয়।

—বই পড়তে পারবে বলে মনে কর?

—এক আধটু যদি পাতা ওলটায়।

ফিরে আসতে আসতে বললাম, 'কথাটথা বলে কিছু?'

—একেবারেই না, মাথা নেড়ে বলল মানদা। ওর নিজের কথা জিজ্ঞেস

করে দেখেছি। তাতে শুধু ওর কষ্ট বাড়ে। সেরে উঠুক। আস্তে আস্তে সব জানা যাবে।'

জানা গেল কদিন পরেই। সকালের আফিস। নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। বড় সাহেব "সেলাম" জানালেন। গিয়ে দেখি, তাঁর টেবিলের পাশে একটি অপরিচিত সুদর্শন যুবক। তাকে দেখিয়ে বললেন সাহেব, 'ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। মল্লিকা গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই মেয়েটিই কি সেদিন এল প্রেসিডেন্সি থেকে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, স্যর।'

—তাহলে, দেখাটা তোমার আফিসে বসিয়েই করিয়ে দাও। কি বল, চৌধুরী?

—সেইটাই ভালো হবে।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আসতে আসতে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলেন, 'ও কেমন আছে, স্যর?'

বললাম, 'আগের চেয়ে অনেকটা ভালো। উনি কে হন আপনার?'

—আমার স্ত্রী।

মেয়েটিকে নিয়ে আসবার জন্যে মানদাকে খবর পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে এল, কিন্তু একা। বললাম, 'কই, মল্লিকা কই?'

—সে এল না, বাবু।

—কেন?

—তা কেমন করে বলবো? অপ্রসন্নকণ্ঠে জবাব দিল মানদা।

—তার স্বামী এসেছেন দেখা করতে, বলেছিলে?

—বলেছি বৈকি? একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইল। কিছুতেই আনা গেল না।—বলে, কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। ইনিই যে মল্লিকার স্বামী, তার বুঝতে বাকী ছিল না।

ভদ্রলোক ক্ষীণকণ্ঠে অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, 'তাহলে সেই-রকমই আছে, দেখছি।'

বললাম, 'ওখানেও দেখা করত না?'

—প্রথম দিকটা করত। খুব boisterous ছিল তখন। চেঁচাত, কাঁদত, হাসত, আবোল-তাবোল বকত। কিন্তু দেখা করতে আপত্তি করত না।

—আপনি বরাবর কলকাতাতেই আছেন?

—আজ্ঞে না, আমি থাকি এলাহাবাদ। সেখান থেকে মাসে মাসে এসে দেখে গেছি। মাঝে মাঝে একটু যেন চিনতেও পারত। তারপর হঠাৎ একেবারে গুম হয়ে গেল। কথা বলে না; ডাকলে আসে না।

একটু থেমে বললেন, 'এবার অনেকদিন আসতে পারিনি। কাল ওখানে গিয়ে শুনলাম ওকে এই জেলে পাঠানো হয়েছে। বাড়ি না গিয়ে সোজা স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম। কি জানি কেন মনে হ'ল, এবার বোধহয় দেখা হবে। কথা না বলুক, শুধু একবার দেখা।'

গলাটা ধরে এল ভদ্রলোকের। রুমাল বের করে চেপে ধরলেন চোখের উপর।

বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে আমি চুপ করেই রইলাম। কয়েক মিনিট পরে উনি বললেন, 'এবার তাহলে আমি আসি, স্যর।'

বললাম, 'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

—উঠিনি কোথাও। স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছি।

—এখন কোথায় যেতে চান? আপনার ফিরবার গাড়ি তো সেই রাত দশটায়।

—হ্যাঁ। এ সময়টা ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেব ভাবছি।

—তার মানে হরিবাসর?

মতীশবাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'তা হোক। একটা দিন তো।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

—আজ্ঞে, এগিয়ে দিতে হবে না। গেটটা শুধু পার করে দিন।

গেট পার হয়েও ওকে অনুসরণ কবছি দেখে মতীশবাবু হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'এবার আমি যেতে পারব, স্যর। আপনি আর কষ্ট করবেন না।'

—চলুন না!

একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে এসে বারান্দার সিঁড়ি দেখিয়ে বললাম, 'এই দিকে—'

উনি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'এটা—'

—হ্যাঁ; এটাই আমার প্রাসাদ। পৈতৃক নয়, সরকারী। তবে আপনার ওয়েটিং রুমের চেয়ে নেহাত খারাপ হবে না।

মতীশ ইতস্ততঃ করে বললেন. 'কিন্তু—'

—আমার অসুবিধা হবে, এই বলবেন তো? তা আর কি করবো?

উপস্থিত মত অনাড়ম্বর মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে দুজনে এসে বাইরের বারান্দায় দুখানি ক্যাম্প-চেয়ার দখল করলাম। সামনে খানিকটা দূরে সু-উচ্চ জেলের পাঁচিল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মতীশ আস্তে আস্তে বললেন, 'ঐ পাঁচিলের ওপারটাতেই বুঝি ওদের ওয়ার্ড?'

বললাম, 'হ্যাঁ। খানিকটা গিয়েই।'

—কি মজা, দেখুন! একদিন যে আমাকে সব দিয়েছিল, আজ সে চোখের দেখাটাও দিল না। অথচ, এর জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। সেও না, আমিও না।

আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান এসে জানিয়ে গেল, 'মা বলছেন কাকাবাবুর বিছানা দেওয়া হয়েছে।'

বললাম, 'মতীশবাবু, এবার আপনাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। এটা কিন্তু আমার অনুরোধ নয়, আপনার বৌদিদির আদেশ, এবং তার ওপরে আপীল চলে না।'

মতীশবাবু হেসে বললেন, 'বেশ তো। আর আপনি?'

—আমিও উঠছি। আদেশটা আমার ওপরেও প্রযোজ্য।

জেলের পাশেই এক মাইল চওড়া ঘোড়দৌড়ের মাঠ। তারই মাঝখানে একটি সবুজ কোমল গল্‌ফ্‌-চত্বরের উপর গিয়ে বসলাম দুজনে। সূর্য তখন অস্ত গেছে। বৈশাখ মাস। শুক্ল পক্ষ। সামনের ঐ সুপারি, নারিকেল বাঁশবনে ঘেরা গ্রামের কোল ঘেঁষে চাঁদ উঠবে একটু পরেই। সেই পরম আবির্ভাবের পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে তরুশ্রেণীর মাথার উপর। ঐ দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে ছিলেন মতীশবাবু। তারপর একসময়ে বলে উঠলেন, 'খাঁটি কলকাতার জীব আমরা। এতখানি খোলা-মেলা আমাদের ধাতে সয় না।'

—এসব দেশে আসেননি কোনোদিন?

—এসেছিলাম একবার বছর দুয়েক আগে। ঐ নারকেল সুপারির ঘন লাইনের দিকে চেয়ে সেই দিনটার কথাই ভাবছিলাম।

—বেড়াতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ; তা প্রথমটা একরকম বেড়াতেই।

—শেষটায়?

—শেষটায় যা ঘটল, আজও তার জের টানছি। হয়তো সারাজীবন টেনেও শেষ হবে না।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, যোগাযোগটা আপনাদের ঘটল কেমন করে?

—সে বিচিত্র উপন্যাস শুনতে গেলে আপনার ধৈর্য থাকবে না, দাদা।

—একবার পরীক্ষা করে দেখতে আপত্তি আছে কিছু?

—আপত্তি!—মৃদু হাসির শব্দ তুলে বললেন মতীশ। 'এই কটি ঘণ্টা যে পরিচয় আপনার পেলাম, তারপরে আর ও জিনিসটা থাকতে পারে না। কিন্তু সে একঘেয়ে দুঃখের কাহিনী—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'দুঃখ জিনিসটা ফেলনা নয়, মতীশবাবু। তাকেও সম্পদ করে তোলা যায়, যদি মনের মত কাউকে ভাগ দিতে পারেন।'

মতীশের মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মাটির দিকে চেয়ে থেকে নির্লিপ্ত শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'বেশ; তাহলে শুনুন।'

মতীশ গাঙ্গুলীর কাহিনী শুরু হ'ল—

কলেজের বন্ধুদের মধ্যে সব চেয়ে যার সঙ্গে ভাব হয়েছিল এবং কলেজ ছাড়বার পরেও তাতে ফাটল ধরেনি, তার নাম হীরালাল। বাড়ি ছিল বাঙাল দেশের কোন্‌খানে, ঠিক জানতাম না। হঠাৎ একদিন আমার পড়বার ঘরে এসে বলল, 'আমার বিয়ে। তোমাকে যেতে হবে আমাদের দেশে।'

বললাম, 'সর্বনাশ!'

—সর্বনাশ কেন?

—আরে, আমরা হলাম নির্ভেজাল কলকাতার লোক। শেয়ালদ'র স্টেশনে গাড়ি চড়া আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

হীরালাল শুনতে চায় না। বুঝিয়ে বললাম, 'কোলকাতার বাইবেও যে বাংলা দেশ আছে, আমাদের কাছে তার অস্তিত্ব শুধু ভূগোলের পাতায়। আমার মা বোন বৌদিরা কেউ ভূগোল পড়েননি। পড়লেও ভুলে গেছেন।'

কিন্তু হীরালাল একেবারে নাছোড়বান্দা। বাঙালের গোঁ যাকে বলে। সরাসরি বাবার কাছে গিয়ে আবেদন পেশ করল এবং একরকম জোর করেই সেটা মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে এল। মা অসন্তুষ্ট হলেন। বিধবা বোন মঞ্জরি রুষ্ট হয়ে রইল। যাবার দিন বিছানা-পত্তর সুটকেস ইত্যাদি গুছিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'দেখো দাদা, বন্ধুর দেশের কোনো বিদ্যেধরী যেন ঘাড়ে চেপে না বসেন।'

হেসে বললাম, 'চাপলে মন্দ কি? ও দেশের মেয়েগুলো সত্যিই সুন্দর। তোদের মত ঢেপ্‌সি নয়।'

'মুখে আগুন!'—বলে আমার ভগিনী এমন মুখ করলেন, যেটা শুধু ঐ বস্তুটিযোগেই হতে পারে।

আমাদের বংশে আমিই প্রথম শেয়ালদ'র স্টেশনে গাড়ি চড়লাম। যশোরে পৌঁছে আমার জিনিসপত্রের লাগেজগুলো খুলে দেখা গেল, এই কটা দিন কাটাবার মত আবশ্যক অনাবশ্যক কোনো জিনিসই বাদ দেননি আমার ভগিনী। মায় মুখশুদ্ধির মশলা, দাঁতখোঁচাবার নিমের খড়কে এবং গায়ে মাখবার সর্ষের তেল। হীরালালের বৌদি এসে গম্ভীরভাবে বললেন, 'দুটো জিনিস কিন্তু আনতে ভুলে গেছেন, ঠাকুরপো।'

বললাম, 'কি জিনিস?'

—চাট্টে চাল আর একটু নুন।

গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললাম, 'চিন্তিত হবেন না। ওগুলো পার্শেলেও এসে পড়তে পারে।'

সকলের সম্মিলিত হাসি।

যশোর থেকে মাইল পনেরো দূরে কী একটা গ্রামে কনের বাড়ি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে দুখানা বড় নৌকো করে রওনা দিলাম বর আর বরযাত্রীর দল। বর্ষাকাল। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে, পাটক্ষেত পাশে ফেলে, কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে, খাল বিল মাঠ পেরিয়ে নৌকো চলল। দুধারে আম-কাঁঠাল নারিকেল সুপারির বন। বাঁশ-ঝোপ নুয়ে পড়েছে জলের উপর। সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছুলাম ওদের ঘাটে। সেখান থেকে হাঁটা-পথে এক

মাইল। গোটা তিনেক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে অপেক্ষা করছেন কনেপক্ষ। বরযাত্রী দলে গুঞ্জন উঠল—বরের জন্যে পালকি আসেনি, এ কি রকম ব্যবস্থা ? হীরালালের বাবা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'এ তোমাদের ভারি অন্যায়। পালকি আসবে কোত্থেকে তা বোঝ না ? মেয়েটার মা নেই, বাপ নেই। গরীব ভগ্নিপতি বামুন-পণ্ডিত মানুষ। কোনো রকমে নমো-নমো করে পার করছে শালীটিকে।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'গাড়ি-পালকি দেখে তো আর বিয়ে দিচ্ছি না। দেখেছি শুধু মেয়েটি। মায়ের আমার সাক্ষাৎ কমলার মত রূপ। ভালোয় ভালোয় দুহাত এক হোক। ঘরের বৌ ঘরে নিয়ে যাই। গাড়ি-পালকি ওখানে গিয়ে চড়বে যত খুশি। কি বল বাবা, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে এটুকু হেঁটে যেতে ?'—বলে বৃদ্ধ আমার পিঠে হাত রাখলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না। আমার বেশ ভাল লাগছে, কাকাবাবু।'

চারদিকে জঙ্গলে ঘেরা দুতিনখানা খড়ের ঘর। তারি একটিতে বর এবং বরযাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা। পরিপাটি করে গোবর নিকানো মাটির মেঝে। তার উপরে ফরাস। বরের জন্যে একখানা পাড়ের সুতো দিয়ে তৈরি আসন। ঝালর দেওয়া তাকিয়া। আসনে একটি চমৎকার হরিণ, তাকিয়ার গায়ে সুদৃশ্য গোলাপ। সুরুচি এবং সূক্ষ্মশিল্পের পরিচয়। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। কনেপক্ষের একটি ভদ্রলোক লক্ষ্য করে বললেন, 'এ সবই মেয়ের হাতের কাজ।' বললাম, 'ভারি সুন্দর তো ?' হীরালালের মুখে খুশী এবং গর্বের ঝলক খেলে গেল।

নটায় লগ্ন। বরের ডাক পড়ল বিবাহ-সভায়। ওর একটু বাইরে যাওয়া দরকার। বাড়ির গায়ে পুরানো পুকুর। সরু পায়ে-চলার পথ। দুধারে জঙ্গল। হারিকেন নিযে একজন লোক চলল পথ দেখিয়ে। 'ওখানেই বসুন, আর ওদিকে যাবেন না'—বললে পেছন থেকে। হীরালাল লাজুক মানুষ, তায় নতুন বর। আর একটু এগিয়ে গেল পুকুরপাড়ের দিকে। তারপরেই এক চিৎকার। লোকটি ছুটে গিয়ে দেখল, পায়ের একটা আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে। লোকজন ভেঙে পড়ল লাঠি সোটা মশাল নিয়ে। খানিকটা খোঁজা-খুঁজির পর ধরা পড়ল সাপ। সাক্ষাৎ যম। ওদেশে বলে খৈয়ে গোখ্‌রো। হীরালালকে তার আগেই ধরাধরি করে আনা হয়েছিল বৈঠকখানায়। ওঝা এসে ঝাড় ফুঁক শুরু করল। ডাক্তারও একজন এলেন ব্যাগ্ হাতে করে। কিন্তু

হীরালাল আর চোখ খুলল না, কথাও বলল না। ঘণ্টা খানেক পরে তার ফর্সা দেহ নীল হয়ে গেল। মুখ দিয়ে উঠল আঁজলা। আরো কিছুক্ষণ পরে ও-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ওঝা এসে ওর চুল ধরে আলগোছে টান দিলেন। একটা গোছা উঠে এল হাতের মুঠোয়। ওঝার মুখ কালো হয়ে গেল। বিড়-বিড় করে বললেন, 'আর আশা নেই।'

ভিতরে বাইরে কান্নার রোল পড়ে গেছে। কনের ভগ্নিপতি হায় হায় করে বেড়াচ্ছেন; আর নিশ্চল পাথর হয়ে বসে আছেন বরের বাপ। মাঝখানে একবার কাকে যেন বললেন, 'দ্যাখ তো পালকি পাওয়া যায় কিনা, ঘাট পর্যন্ত। টাকা যা চায়, দেবো। তোমাদের বড্ড শখ ছিল......।' এমন সময় কে এসে জানাল কনে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে-কথা শুনে কারো কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। যে-যেমন ছিল, বসে রইল মৃতদেহের চারদিকে। আমি ছিলাম এক কোণে। একটি কিশোরী মেয়ে এসে বলল, 'আপনি একবার ভেতরে আসুন।' কোথায়, কেন, কে ডাকছে, কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে যন্ত্র-চালিতের মত চললাম ওর পেছনে। উঠোনে বিয়ের সমস্ত আয়োজন তেমনি সাজানো। তার পাশ দিয়ে নিয়ে গেল একটা ঘরে। বারান্দা পার হয়ে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। পরনে লাল চেলি। কপাল এবং কপোল জুড়ে শ্বেত-চন্দনের আলপনা। হাতে গলায় সামান্য দু-একখানা অলঙ্কার। একটা নতুন পাটির উপর যে মেয়েটি চোখ বুজে শুয়ে আছে, মনে হ'ল সে মেয়ে নয়, কোনো সুদক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমা।

একদল মেয়েমানুষ চারদিকে ভিড় করে কলরব করছিল। আমাকে দেখে সব সরে গেল। আধঘোমটা-পরা একটি মহিলা এগিয়ে এসে ধরা গলায় বললেন, 'দেখুন তো, ভাই, এটারও বোধ হয় হয়ে গেল। চোখও খুলছে না, সাড়াও দিচ্ছে না।'

অনুমান করলাম, উনিই কনের দিদি। গায়ের চাদরটা খুলে রেখে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'জল নিয়ে আসুন এক বালতি। আর, জানলার কাছ থেকে সবাই সরে যান আপনারা।' মুহূর্ত মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেবার পর চোখের পাপড়ি দুটো কেঁপে উঠল দু'একবার। তারপর আস্তে আস্তে খুলে গেল। বেরিয়ে পড়ল দুটি অপূর্ব নীল তারা। নীলোৎপল কথাটা কাব্যে পড়েছি। আজ স্বচক্ষে দেখলাম। প্রথমটা যেন ও কিছুই বুঝতে পারলো না। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই

চমকে উঠল। বুকের উপর ক্ষীপ্রহস্তে টেনে দিল স্খলিত আঁচলখানা। ধড়মড় করে উঠে বসে গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে দিল পরনের শাড়ি। আমি তাড়াতাড়ি কাঁধের পাশটা ধরে শুইয়ে দিয়ে বললাম, 'না, না, উঠবেন না। শুয়ে থাকুন।' ওর দিদির দিকে চেয়ে বললাম, 'একটু দুধ নিয়ে আসুন, গরম দুধ।' মেয়েটি পাশ ফিরে চোখ বুজল। হারিকেনের মৃদু অলোকে দেখলাম দুচোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ফোঁটা।

উঠোনের একধারে তখন একটা ছোটখাটো বৈঠক বসেছে। গ্রাম্য-প্রধানের দল। সকলেই বয়সে প্রবীণ। সেখান দিয়ে যখন বৈঠকখানায় ফিরে যাচ্ছি, একজন প্রশ্ন করলেন, 'জ্ঞান ফিরল, বাবা?' মাথা নেড়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—না ফিরলেই ছিল ভালো, বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। আরেক জন বললেন, 'যে গেল সে তো গেলই। এবার যে রইল তার একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বাবা? বসো। ওরে, কে আছিস? একটা টুল-ঠুল নিয়ে আয় তো।'

আমি সেই সতরঞ্চির এক ধারে বসে পড়ে বললাম, 'না, না। টুল দরকার নেই। আমি এখানেই বসছি।'

—আহা, ধুলোর মধ্যে বসলে। দাঁড়াও, একটু ঝেড়ে দিচ্ছি। কলকাতার ছেলে। এসেছ আমাদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তারপর এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল। তোমার বড্ড কষ্ট হ'ল, বাবা।—বলে ভদ্রলোক তার কাঁধের গামছা দিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন। ওদিকে একজন তামাক টানছিলেন। হুঁকোটা অন্য হাতে চালান করে আগের প্রস্তাবের জের টেনে বললেন, 'ব্যবস্থা আর কি? বিয়ে তো দিতেই হবে রাতের মধ্যে। তা না হলে সমাজে পতিত হবেন যাদব বাবাজি। আর মেয়েটাকেও থাকতে হবে আজীবন আইবুড়ো।'

যাদববাবু কনের ভগ্নীপতি। হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা পাঁচ-জন আছেন। গরীবকে যেমন করে হোক, উদ্ধার করুন। এখন আর ভালমন্দ বাচবিচারের সময় নেই।'

আগের ভদ্রলোকটি বললেন, 'হুঁ। মুশকিলের কথা। ছেলে-ছোকরাগুলো বেশীর ভাগ বিদেশে। হাতের কাছে কাউকে তো দেখছি না। এক বিপিন চাটুয্যে মশাই আছেন। বয়স হয়েছে বটে। সংসারও তিনটি। তবে কুলীন সন্তানের পক্ষে সেটা বেশী কিছু নয়। তাছাড়া অবস্থা ভালো। উনি যদি রাজী হন, মেয়েটা আর যাই হোক, খাওয়া পরার কষ্ট পাবে না।'

যাদব বললেন, 'উনি রাজী হবেন কি ?'

—তা হবেন, বললেন একটি দন্তহীন ভদ্রলোক। শালীটি তো তোমার ডানাকাটা পরী হে। তবে নগদ কিছু দিতে হবে।

—তা দেবো। তবে জানেন তো আমার অবস্থা। আপনারা দয়া করে একটু বলে কয়ে দেখুন। আমিও হাতে পায়ে ধরি গিয়ে। যতটা অনুগ্রহ করেন।

'আমাদের যতদূর সাধ্য, আমরা নিশ্চয়ই করবো,' বললেন আগেকার সেই ভদ্রলোকটি। 'মেয়ে নয়, বোন নয়, শালী। তবু তুমি যা করেছ বাবাজি, ক'জনে করে আজকাল ?'

—সে কথা একশোবার। সে আমরা সবাই বলাবলি করেছি, বললেন মুরুব্বিগোছের আরেকজন।

—তাহলে আর দেরি নয়। চল, সবাই মিলে চেপে ধরি গিয়ে চাটুয্যেকে। রাত তো আর বেশী বাকি নেই।

কয়েক মিনিট ছেদ পড়ল মতীশের গল্পে। জ্যোৎস্নালোকে তার মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল একটু যেন ইতস্ততঃ করছেন ভদ্রলোক। বললাম, 'আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই, মতীশবাবু। বয়সে আমি হয়তো চার পাঁচ বছরের বড়। আমাদের পরিচয়ের পরিমাণটাও চার পাঁচ ঘণ্টার বেশী নয়। তবু এই জেলের সর্দারটিকে বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।

—সে কথা কেন বলছেন, দাদা! আহত সুরে বললেন মতীশবাবু। আগেই তো বলেছি। একান্ত আপনার জন না হলে কাউকে এসব কথা বলা যায় ? সেজন্যে নয়। সে রাতটা যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। এমনি জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। বর্ষারাত হলেও আকাশ ছিল এমনি নির্মেঘ। যাক......। ওঁরা ওঠবার আয়োজন করতেই কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল আমার বুকের ভেতরটা। হ্যাঁ। বাড়ির কথা মনে পড়েছিল বৈকি ? বাবার কঠিন মুখ, মায়ের চোখের জল, ছোট বোনের বিষমাখানো শ্লেষ, এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আমাদের হাতীবাগান, বাগবাজার আর কালীঘাটের রুদ্রমূর্তি। সবই দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের উপর। কিন্তু সে সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল একখানি কুণ্ঠাজড়িত মুখ আর দুটি অসহায় চোখের নীল তারা। মনে

হয়েছিল, এ অপূর্ব সম্পদ যেন আমারি জন্যে অপেক্ষা করছিল বিধাতার হাতে। তা যদি না হবে, এদেশে আমি আসবো কেন? হীরালাল এমন করে মরবে কেন, আর এত লোক থাকতে আমারই বা ডাক পড়বে কেন তার মূর্ছিতা কনের চোখে জল ছিটোবার জন্যে?

যাদববাবু ঘর থেকে একটা চাদর নিয়ে ফিরে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অনুমতি করেন তো, আমার একটা কথা বলবার ছিল।'

উনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'বলুন।'

—আমাকে যদি অযোগ্য মনে না করেন, আর আপনার শ্যালিকার যদি আপত্তি না থাকে, ওঁকে তাহলে—আমরা নৈকষ্য কুলীন। পদবী গঙ্গোপাধ্যায়।

যাদববাবু আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন, 'এতখানি সৌভাগ্য কি আমার সইবে, ভাই?'

চারদিকে সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন, 'কলকাতার ছেলে তো। প্রাণ আছে, দয়া ধর্ম আছে।' আর একজন বলে উঠলেন, 'ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন, যাদব। উনি নররূপী দেবতা।' এমনি ধাবা সব মন্তব্য। কথাটা হীবালালের বাবার কানে গেল। আমাকে ডেকে পাঠালেন। অপরাধীর মত কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এগিয়ে এসে হঠাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি, বাবা। তুমি সুখী হও। আমার মাকে কোনো-দিন অনাদর করো না।'

এতক্ষণে তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

এপাশে আমার বন্ধুর মৃতদেহ পালকি চড়ে চলে গেল নদীর ঘাটে। ওপাশে আমি গিয়ে বসলাম ববের আসনে। একদিকে হরিধ্বনি, আরেক-দিকে হুলুধ্বনি। প্রতিটি মন্ত্র স্পষ্ট করে এবং শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে মল্লিকাকে গ্রহণ করলাম।

মতীশের মৃদুকণ্ঠ হঠাৎ বন্ধ হ'ল।

বললাম, 'তাবপর?'

—'তারপর'এব তো আর শেষ নেই, দাদা। এ তো কেবল শুরু। কিন্তু এবার আমাকে ট্রেন ধবতে হবে।

—ট্রেন ধরবে কাল বেলা একটায়।

মতীশ চুপ করে রইল।

বললাম 'বন্ধু বলে যখন স্বীকার করেছ, ভায়া, বুকখানা একটু হালকা

করে যাও। এখনো অনেক দিন বেঁচে থাকতে হবে।

ডান হাতখানা রাখলাম ওর পিঠের উপর। মতীশ বসে ছিল দুহাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

ধীরে ধীরে বারংবার বিরাম নিয়ে নিয়ে মতীশ বলে গেল তার স্বল্পজীবী বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী। মাত্র দুটি বছরের ইতিহাস। কিন্তু তার প্রতিটি দিন বেদনায় ম্লান, প্রতিটি রাত্রি দুঃখে নিবিড়। নিঃশব্দে শুনে গেলাম। যখন শেষ হ'ল, চাঁদ অস্ত গেছে। রাত কত জানি না। অন্ধকার মাঠে চার-পাঁচটা আলো ছুটাছুটি করছে। মতীশ বলল, অতগুলো আলো নিয়ে ঘুরছে কারা?

বললাম, সিপাইরা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। তোমার বৌদি হয়তো পুলিসেও খবর দিয়ে থাকবেন। আর বসে থাকা নিরাপদ নয়।

মতীশের শ্রোতা সেদিন যে-মন নিয়ে প্রায় সমস্ত রাত ধরে তার কাহিনী শুনেছিল, আমার শ্রোতাদের কাছে সে মনোযোগ আশা করবো, এতটা বুদ্ধি-ভ্রংশ আমার ঘটেনি। তাই, যে-কথা আমার-আপনার কাছে তুচ্ছ, কিন্তু তার কাছে অমূল্য, সে সব রইল অনুক্ত। বর্ণ মাধুর্যের সমস্ত রস রইল আমার কাছে। যেটুকু দিলাম, সেটা শুধু রেখাচিত্র, আপনারা যাকে বলেন স্কেচ্।

সকালের গাড়িতে বৌ নিয়ে মতীশ এসে উঠল তাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে। দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ির মুখেই মঞ্জরির সঙ্গে দেখা।

—এ কে, দাদা?

—তোর বৌদি।

—মানে?

—'বৌদি' কথাটার মানে বুঝিস না, তোকে তো এতটা মুখ্যু বলে জানতাম না।

মল্লিকার দিকে ফিরে বলল, আমার ছোট বোন মঞ্জরি।

মল্লিকা কুণ্ঠিত হাসি-মুখে একপা এগিয়ে গেল ননদের দিকে। সে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরে গেল ঝড়ের মত। মতীশ বৌ নিয়ে উপরে উঠে গেল। মার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকল, মা।

—কে, মতীশ এলি ?

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। পরণে পট্টবাস। এইমাত্র আহ্নিক সেরে উঠেছেন।

তোমার বৌ নিয়ে এলাম মা, কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল মতীশ। মল্লিকা নত হয়ে প্রণাম করতে গেল। সুহাসিনী চৌকাঠের ওপার থেকেই শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, থাক, বাছা।

বলে খানিকটা সরে গেলেন ভিতরের দিকে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ব্যাপার কি, মতীশ ?

—ব্যাপার তো দেখতেই পাচ্ছ। বিয়ে করেছি। আর যা জানতে চাও, আস্তে আস্তে বলছি। তার আগে—

কথাটা শেষ না হতেই মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কয়েক মিনিট পরেই কানে এল তার বাবার ক্রুদ্ধস্বর—অ্যাঁ! বলকি! বিয়ে হয়ে গেছে! আচ্ছা, ডেকে দাও তো হতভাগাটাকে।

ডাকতে হ'ল না। মতীশ নিজেই গেল বাপের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গেই উনি রুক্ষ কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, এসব কি শুনছি ?

—যা শুনেছেন, সত্যি।

—আমাদের অনুমতি না নিয়েই বিয়ে করেছ ? খবরটা পর্যন্ত দেবার প্রয়োজন বোধ করনি ?

—খবর দেবার সময় ছিল না। অনুমতি নেবারও উপায় ছিল না। সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

—শুনতে চাই না তোমার সব কথা, খেঁকিয়ে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু, যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। এবার তাহলে আমার কথা শোনো। অতখানি স্বাধীন যখন মনে করছ নিজেকে, তখন যাকে এনেছ, তার ভারও নিজের কাঁধেই নিতে হবে। আমি তোমার এ বিয়ে স্বীকার করি না।

মতীশ মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মনে হ'ল সেখানেও রয়েছে এই কথারই সমর্থন। 'বেশ' বলে বেরিয়ে এল বাবার ঘর থেকে। মায়ের ঘরের বাইরে বারান্দার এক কোণে লজ্জা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে তার সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী। গাঙ্গুলী বাড়ির প্রথম পুত্রবধূ। কিন্তু গাঙ্গুলী বাড়ি তাকে স্বীকার করল না।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল মতীশ, চল, মল্লিকা। মল্লিকা চোখ তুলে

একবার চেয়ে দেখল স্বামীর মুখের দিকে। তারপর নিঃশব্দে তার অনুসরণ করল।

সিঁড়ির সামনেই থামতে হ'ল। ছোট ভাই জিতেশ উপরে উঠছে। ধুতিটা লুঙ্গির মত করে পরা। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। হাতে টুথপেস্টের টিউব, আর ব্রাস। এই সবে ঘুম ভেঙেছে কিছুক্ষণ হ'ল। দাদার সঙ্গে বয়সের তফাৎ বেশি নয়। লেখাপড়ায় অনেক তফাৎ। ফার্স্ট ইয়ারেই কেটে গেল বছর দুই। অর্থাৎ নামটা আছে কলেজের খাতায়, মানুষটা থাকে ক্রিকেট ফিল্ডে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছ সুটকেস নিয়ে?

—যাচ্ছি যেখানে খুশি। তুই সর।

—আহা, তুমি না হয় গেলে, নতুন বৌকে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?

—তা দিয়ে তোর কাজ কি?

—তার মানে একটা হোটেল-টোটেলে গিয়ে উঠবার মতলব। তোমার তো বাপু বন্ধু-বান্ধব কেউ কোথাও নেই। জানো খালি বাড়ি আর দারভাঙ্গা বিল্ডিং।

মল্লিকা ছিল দাদার পেছনে। তার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়াও, বৌদি, পেন্নামটা সেরে নিই। আমার এই দাদাটিকে তুমি এখনো চিনতে পারনি। বি-কম্ পাস করলে কি হয়, বুদ্ধি-শুদ্ধি বেজায় কম। বুক-কিপিং ছাড়া আর কিছু বোঝে না। চল।

বলে, মল্লিকার পিঠে হাত দিয়ে একরকম জোর করেই নিয়ে চলল মার ঘরের দিকে। দরজার সামনে গিয়ে বলল, আচ্ছা, মা। আমি তো তোমাদের কুপুত্তুর। মুখ্যু মানুষ। ফেল করি আর ব্যাট্ পিটিয়ে বেড়াই। আমার কথার কোনো দামই নেই। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা না বলেও তো পারি না। নতুন বৌ যদি হোটেলে গিয়ে ওঠে, গাঙ্গুলী বাড়ির মুখ উজ্জ্বল হবে কি?

—তোকে সর্দারি করতে কে বলেছে জিতু?—রুক্ষ কণ্ঠে সাড়া দিলেন সুহাসিনী।

না; তা কেউ বলেনি। তবু গায়ে পড়েই বলতে হয়। যা হয়ে গেছে, একদিন যা মেনে নিতে হবে, তাকে গোড়া থেকে স্বীকার করে নেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? বাবাকে এই সোজা কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে না? এসো বৌদি—

উত্তরের অপেক্ষা না করেই জিতেশ তার বৌদিকে নিয়ে গেল মতীশের ঘরে। বলল, এই তোমার ঘর। জঙ্গল বললেও পার। যত রাজ্যের পুরানো বই আর ছেঁড়া ম্যাগাজিন। তাই বলে পড়বার মতো কিছু পাবে না। সব বুক-কিপিং, ব্যাঙ্কিং আর কি সব ছাই ভস্ম। তারই মধ্যে ডুবে আছে। খিদে পেল কিনা তাও অন্য লোককে বলে দিতে হয়। দ্যাখ, এইবার তুমি যদি পার এই বই-পাগল লোকটাকে মানুষ করতে। সেই সঙ্গে তার এই মুখ্যু ছোট ভাইটাকেও একটু দেখো মাঝে মাঝে। দেখবে তো?

জিতেশের হাসি মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকাও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার চোখদুটো ভরে উঠল জলে। জিতেশ সেদিকে একবার চোখ তুলে কথা ঘুরিয়ে নিল, আচ্ছা, তাহ'লে তুমি এখন চানটান সেরে নাও। এই পাশেই বাথ্‌রুম। আমি একটু চায়ের চেষ্টা দেখিগে।

স্বর নামিয়ে বলল, ওটা আবার ছোড়দির ডিপার্টমেন্ট্। বড্ড মুখ ঝাম্‌টা দেয় একটু দেরি করে উঠি বলে। আচ্ছা, কদিন যাক্ না। তারপর অসময়ে চা-টার দরকার হ'লে তোমার কাছেই আসবো। কি বল?

আঁচলে চোখ মুছে মৃদু কণ্ঠে বলল মল্লিকা, তাই এসো, ভাই।

বিকাল না হতেই নানা রঙের এবং নানা আকারের গাড়ি এসে জমতে শুরু হল গাঙ্গুলী বাড়ির গেটের সামনে। কয়েকজন আরোহী, বেশীর ভাগই আরোহিণী। একে একে তাঁরা জমায়েত হলেন দোতলার হলঘরে। নিজেদের মধ্যে চলল ঘন্টাখানেক প্রাথমিক আলোচনা। তারপর মতীশের ডাক পড়ল। সে তার চিলে কোঠার ঘরে বসে কি একটা পড়ছিল। জিতেশ এসে দরজায় হাঁক দিল আদালতের পেয়াদার ভঙ্গীতে, এক নম্বর আসামী হাজির? এক নম্বর আসামী।

—কি ব্যাপার?

—তোমাকে তলব করেছেন ও'রা, মানে The Honourable Full Bench.

—কে কে আছেন রে?

—বললাম তো ফুল বেঞ্চ্। নাম চাও? কাগজ পেন্সিল নাও। শ্যাম-বাজার থেকে এসেছেন ছোট পিসীমা আর তার দুই মেয়ে গীতা আর রীতা। ভবানীপুর থেকে বড়দি আর তার চার রত্ন, নাম ভুলে গেছি। চোরবাগান থেকে মেঝো কাকীমা আর পটলডাঙ্গা থেকে ছোড়দির শাশুড়ী। তার

সঙ্গে রয়েছেন তার ছোট জা কল্যাণীদেবী। আরো কারা কারা আছেন, বল তো আবার গিয়ে মুখস্থ করে আসি।

—থাক্ আর মুখস্থ করতে হবে না।

মতীশ এসে দাঁড়াল কাঠগড়ায় মাসী পিসীদের কাছে তার হঠকারিতার কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চলল জবানবন্দী। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে জেরা। মতীশ জানিয়ে দিল সমস্ত ঘটনা এবং দুর্ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ। বলল না শুধু সেইটুকু যা তার একান্ত আপনার ধন, পৃথিবীতে আর কারো যাতে প্রয়োজন নেই। মূর্ছিতা মল্লিকার পাশে সেই কটি বিরল মুহূর্ত, যারা তার সংকীর্ণ জীবন ধরায় এক নিমেষে দিয়ে গেল বন্যার আলোড়ন।

বিচারকমণ্ডলী রায়দান শুরু করলেন। পিসীমা বললেন, সবতো বুঝলাম, বাবা। কিন্তু একথা তোমারও বোঝা উচিত ছিল, ঐ মেয়ে আমাদের দেশের নয়, সমাজের নয়, ও কখনো আপনার হবে না। তাছাড়া বাঙাল দেশের পাড়াগাঁ থেকে কত কুশিক্ষা, কত রোগের বীজ নিয়ে এসেছে, কে জানে? ও কি আমাদের ঘরের যোগ্য?

মঞ্জরির শাশুড়ী ঠাক্রুণ মৃদুকণ্ঠে বললেন, বিয়ের আসনে বসতে গিয়ে যার বর অপঘাতে মারা যায়, সেই দুর্লক্ষণা কন্যা ঘরে আনে কেউ? শিক্ষিত ছেলে হয়ে এ তুমি কী কাজ করলে বাবাজি?

কাকীমা তিক্ত কণ্ঠে বললেন, বাহাদুরি দেখাবার আর জায়গা পেলে না তুমি? হতই বা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে? তাতে আমাদের কি? পাড়াগাঁয়ে গরীব লোকের মধ্যে ঐ রকমই তো হয়। এই তো আমাদের চাকরটা সেদিন বিয়ে করে এল। কনের বয়স শুনলাম বারো, আর ও মিন্সে তো ঘাটের মড়া বললেই চলে। ওরা আমাদের কে, যে ছেলের কর্তব্য-জ্ঞান উথ্লে উঠল?

—কর্তব্য-জ্ঞান না ছাই!—ফেটে পড়লেন বড়দিদি। চাঁদপানা মুখ দেখে বাবু আমাদের মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। কি খাইয়ে বশ করেছিল কে জানে? পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষগুলো কত রকম তুকতাক জানে, শুনেছি।

—আমি সেটা আগেই বলেছিলাম, দিদি, যোগ করলেন মঞ্জরি, বলুক তো দাদা, সাবধান করে দিইনি যাবার সময়?

সকলের শেষে মন্তব্য করলেন গৃহকর্তী,—ছেলের দোষ দিয়ে কি হবে,

বল। ছেলেমানুষ, ভুলচুক হয়েই থাকে। বুড়ো হয়ে উনি কি করলেন! পই পই করে বারণ করলাম, যেতে দিও না। একে বাঙাল দেশ, তায় পাড়াগাঁ। শুনলেন আমার কথা? আহা বন্ধুর বিয়ে; যেতে চাইছে; যাক্। এখন বোঝো...

এবার ডাক পড়বার পালা দু-নম্বর আসামীর। কারো কারো মতে, প্রধান আসামী। মতীশ ছুটি পেয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল তরুণীর দল। রীতা গম্ভীর মুখে বলল, ডেকে কি হ'বে, মা? দেড় ঘন্টা সাধ্য সাধনার পর দেড়খানা কথা শুনলাম। তাও উর্দু না তেলেগু, বোঝা গেল না। নবীনাদের দল খিল খিল করে হেসে উঠল। বড়দির মেয়ে চামেলি লরেটোতে জুনিয়র কেম্ব্রিজ পড়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, বৌএর সঙ্গে একজন interpretor আনা তোমার উচিত ছিল, বড় মামা। ওর ঐ অভিনব ভাষা তুমি follow করতে পার?

মতীশ যেতে যেতে বলল, তা পারি বৈ কি? তোর ঐ অভিনব ফিরিঙ্গী বাংলার চেয়ে অন্ততঃ বেশী পারি।

চামেলির লম্বা মুখখানা আরো লম্বা হয়ে গেল।

মঞ্জরির জা কল্যাণী বলল, কিন্তু যাই বলুন, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। এ রকম রূপ আমার জানাশোনার মধ্যে আমি দেখিনি।

—ছাই রূপ, ভ্রূকুটি করল মঞ্জরি, ঘোড়ার মত মুখ। চোখদুটো যেন আফিম খেয়ে ঢুলছে। না জানে চুল বাঁধতে, না জানে কাপড় পরতে। সকালে এসে যখন দাঁড়াল, কপালে তেল চক্‌চক্ করছে। তার ওপর এত বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা। মাগো!

রীতা বলল, এখনো দেখে এলাম, মুখটা কেমন তেলা তেলা। টয়লেটের বালাই নেই।

কল্যাণী বলল, সেই কথাই তো বলছিলাম। আমরা এই যে ক'জন রয়েছি এখানে, টয়লেটের কোনো ত্রুটি হয়েছে কেউ বলতে পারবে না! কিন্তু ওসব না ঘষেও ওকে যা দেখাচ্ছে, কেউ দাঁড়াতে পারবে কাছাকাছি?

কল্যাণীর এই স্পষ্ট উক্তি মহিলারা কেউ প্রসন্ন মনে নিতে পারলেন না। অল্প বিস্তর প্রসাধনের চিহ্ন প্রবীণা নবীনা সকলের মুখেই সুস্পষ্ট। তার বিধবা শাশুড়ী ঠাকুরুণটিও সেদিকে কার্পণ্য করেননি। রীতা আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিল; থেমে গেল দরজার দিকে চেয়ে। ঘরে ঢুকল

ক্রিকেটের পোশাক পরা জিতেশ আর তার পেছনে গাঙ্গুলী বাড়ির নববধূ। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি পড়ল তার আনত মুখের উপর। জিতেশ বলল, এসো, বৌদি। এখানে যারা বসে আছেন, ঐ ফাজিল মেয়েগুলো ছাড়া, সবাই তোমার গুরুজন। সকলের পায়ে কপাল ঠুকতে গেলে কপালে আইওডেক্স্ ঘষতে হবে। তার চেয়ে বরং একটা পাইকারী পেন্নাম লাগিয়ে দাও।

বড়দি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, তোকে এ সব ব্যাপারে কে ডেকেছে শুনি? ফাজিল ছেলে কোথাকার!

—আহা, ডাকোনি বলেই তো আসতে হ'ল, বড়দি। গাঙ্গুলী বাড়ির মান-সম্মান নিয়ে তোমরা তো অনেক মাথা ঘামাচ্ছ, দেখছি। নতুন বৌএর কাছে কি মানটা তোমাদের রইল, তাই খালি বুঝলাম না।

—আচ্ছা, তুমি এবার যাও তো, জিতু, বলে কল্যাণী এগিয়ে এসে নতুন বৌএর হাত ধরল। এসো ভাই, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

দিদির সংসারে সমস্ত কাজ ছিল মল্লিকার হাতে। রান্না-বান্না, বাসন মাজা, ঘর নিকানো, এমন কি গোরুর সেবা পর্যন্ত। এখানে তার কোনো কাজ নেই। দু-দিনেই সে হাঁপিয়ে উঠল। এদের রান্নার জন্যে আছে ঠাকুর, ঘরের কাজের জন্যে ঝি চাকর। সকালে বিকালে চায়ের পাট, তাও মঞ্জরির হাতে। একদিন সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল, আমায় একটু দেখিয়ে দাও না, ঠাকুরঝি। মঞ্জরি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, রক্ষে কর ভাই, তোমাদের সোনার অঙ্গে এসব কঠিন কাজ সইবে না। তারপর আর যায়নি। নিজের ঘরখানা ঝেড়ে গুছিয়ে সময় আর কাটতে চায় না। বাকী সময়টা এক আধটু পড়া-শুনা করতে চেষ্টা করে। বইতে মন বসে না। চোখের উপর ভেসে ওঠে তার সেই ফেলে-আসা দিদির বাড়ির দিনগুলো। নিরলস কর্মময় দিন। ভোর থেকে শুরু; অনেক রাতে শেষ। একটা ঘুমের কোল থেকে উঠে আর একটা ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়া। তার মধ্যে নেই আলস্যের অবসর। মল্লিকার দু-চোখ ছাপিয়ে ওঠে জলের ধারা। বইএর অক্ষর ঝাপসা হয়ে যায়।

এমনি একদিন সকাল বেলায় বই হাতে করে বসে ছিল মল্লিকা। নীচে কি একটা সোরগোল শুনে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। গিয়ে শুনল, ঠাকুর

আসেনি। সমস্ত মনটা তার খুশিতে নেচে উঠল। মঞ্জরি অপ্রসন্ন মুখে ঘোরাফেরা করছে। কুণ্ঠিত অনুনয়ের সুরে বলল, আজকার রান্নাটা আমি করি, ঠাকুরঝি। তুমি এই আঁশ-কোশের মধ্যে নাই বা এলে।

—পারবে তুমি ? ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল মঞ্জরি।

—মোটামুটি পারবো। ওখানকার রান্নাতো বরাবর আমিই করেছি।

—ও আমার কপাল! গালে হাত দিয়ে বলল মঞ্জরি, এ কি তোমার সেই পাড়াগেঁয়ে পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি, না, লাউএর ঘন্ট! কি কি হবে শোনো। রুই মাছের ফ্রাই, চিংড়ির কালিয়া, বাবার জন্যে মাংসের স্টু, জিতুর জন্যে ডিমের কোপ্তা। পারবে এসব ?

মল্লিকা হতাশ সুরে বলল, ও-সব তো আমি জানি না, ভাই। ঠাকুর রোজ যা রাঁধে, ঝাল ঝোল শুক্তো ডালনা, সেগুলো একরকম নামিয়ে দিতে পারবো, আশা করি।

—বেশ, রাঁধো। তবে গাদাখানেক ঝাল দিওনা যেন। তোমাদের দেশে তো কাঁচা লঙ্কা ছাড়া আর কোনো মসলা নেই।

খেতে বসে কর্তা প্রশ্ন করলেন, এ সব কে রেঁধেছে মঞ্জু ?

—তোমাদের নতুন বৌ, বাবা।

বিশ্বনাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাতে কিছুই পড়ে নেই। দু-একখানা রান্না বরং পুনশ্চ-রূপে দেখা দিল। উনি কোনো আপত্তি করলেন না।

জিতেশ সকাল সকাল কলেজে চলে গিয়েছিল। একটার সময় ফিরে খেয়ে দেয়ে উপরে এল পেটে হাত বুলোতে বুলোতে।

—বৌদি!

—কি, ঠাকুরপো ?

—হাত দাও।

—সে কি!

—আহা, হাত বাড়াও, হ্যান্ডশেক্ করবো।

মল্লিকা হেসে ফেলল, কেন হ্যান্ডশেকের দরকার পড়ল কিসে ?

চারদিকে চেয়ে গলা খাটো করে বলল জিতেশ, বুঝতে পারছ না! তোমা-

দের ঐ উড়ে মহারাজের পাঁচন আর ছোড়দির অরিষ্ট খেয়ে খেয়ে পেটে চরা পড়ে গিয়েছিল। এ্যাদ্দিন পরে দুটো ভাত খেলাম।

আর একটু কাছে সরে এসে বলল, কিন্তু নিজের পায়ে যে নিজেই কুড়ুল মেরে বসলে, বৌ ঠাকরুণ।

—কেন ?

—বাবা মার মধ্যে পরামর্শ হচ্ছিল, ঠাকুর রেখে আর দরকার নেই। আড়ি পেতে শুনে এলাম। তোমার চাকরি বোধহয় পার্মানেন্ট হয়ে গেল।

—সে তো আমার সৌভাগ্য, ঠাকুরপো। এ ভার যদি সত্যিই ও'রা দেন, আমি বেঁচে গেলাম।

দিনগুলো যেমন করেই কাটুক মল্লিকার, রাতগুলো কাটে মধুর স্বপ্নের মতো। স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যে তার বুক দুরু দুরু করে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখে আসে জল। ভাবে, এত সুখ তার সইবে কি? অনেক রাত পর্যন্ত মতীশকে কাটাতে হয় তার উপরের চিলে কোঠার ঘরে। বাবা মার ঘরের দরজা বন্ধ হলে, তার পর সে নীচে নেমে আসে। সেদিন একটা কি জটিল জিনিস পড়বার ছিল। আরো রাত হ'ল ঘরে ফিরতে। মল্লিকা তখনো জেগে বসে আছে। মতীশ এসে শুয়ে পড়ল তার কোলের উপর। তার লম্বা লম্বা চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল মল্লিকা, তুমি বড্ড গম্ভীর হয়ে গেছ, আগের চেয়ে। হাস না কথা বল না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।

মতীশ তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিযে বলল, কোন্ মুখে হাসব, মল্লি? কি সুখেই না আমরা রেখেছি তোমায়!

—ওসব কথা বললে আমি কিন্তু সত্যিই রাগ করবো। কেন, আমার কষ্ট কিসের? তুমি কাছে আছো, এই তো আমার পরম সুখ। তাছাড়া ঠাকুরপো রয়েছে। ওর জন্যে সাধ্যাকি দু-দণ্ড মন খারাপ করে থাকি?

—হ্যাঁ। ঐ ছেলেটা আছে বলেই এখানে আমরা আছি। না হলে তোমাকে নিয়ে কবে চলে যেতাম। তোমাকে এতদিন বলা হয়নি, মল্লি, আমি চাকরি খুঁজছি। কলকাতায় নয়, বাইরে।

—বাইরে! চমকে উঠল মল্লিকা। বাইরে কেন!

—তোমাকে নিয়ে একদিন ঘর বাঁধবো বলে। তখন আর তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

মল্লিকার বুকের স্পন্দন থেমে গেল যেন। নীচু হয়ে লাজরক্ত ডান কপোল-খানি রাখল স্বামীর কপালের উপর। মৃদু গুঞ্জনের সুরে বলল, এখনো আমার কোনো দুঃখ নেই।

মাসখানেকের মধ্যেই মতীশের চাকরি জুটে গেল। এলাহাবাদে কোনো একটা ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট্। বাবা বললেন, চাকরি করবার কি দরকার পড়ল তোমার? এম-এ টা পাস করলে হ'ত না?

—এম-এ প্রাইভেট দেবো, স্থির করেছি।

মা বললেন, দেশ ছেড়ে এতদূরে যাচ্ছিস! কেন? এক বছর পরে উনি রিটায়ার করলে, ওঁর আফিসেই তো ঢুকতে পারতিস। সায়েব কথা দিয়ে রেখেছে, উনি বলছিলেন।

—কারো কথার উপর নির্ভর করে হাতেব জিনিস ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে কি?

মা আর উত্তর দিলেন না।

সে রাত্রে মল্লিকার চোখে আর ঘুম এল না। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে এতদিনের সংযমের বাঁধ বুঝি ভেসে গেল। অনেকক্ষণ কান্নার পর বুকটা যখন একটু হালকা হয়েছে, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি। তোমাকে ছেড়ে আমি একটা দিনও থাকতে পারবো না।

ওর মুখখানা দু-হাতে ধবে নিজের মুখের কাছে এনে সান্ত্বনার সুরে বলল মতীশ, এরকম ভেঙে পড়লে তো চলবে না, মল্লি। তুমি একটু শক্ত না হ'লে আমি জোর পাব কোথায়?

বাকী রাত ধবে চলল ওদেব স্বপ্নেব জাল বোনা, দু-জনে মিলে নীড় বাঁধবার স্বপ্ন।

স্টেশনে তুলে দিতে গেল জিতেশ। গাড়ি ছাড়বার মিনিট কয়েক আগে বলল, ও-মাসেই আসছ তো?

মতীশ হেসে বলল, কেন, তুই তো রইলি।

—তা বৈ কি! আমি উইকেট আগলাবো, না তোমার বৌ আগলাবো?

—এখন তো দুটোই আগলাতে থাক্, বলে উঠে পড়ল গাড়িতে।

দাদা চলে যাবার পর থেকে জিতেশ রোজ একবার করে উপরে এসে মল্লিকার খোঁজ নিয়ে যায়। বৌদি বলে হাঁক দেয় খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে, বোনার পশম আর পড়বার বই যোগায়, ফাই ফরমাশ খাটে। একদিন দুপুর বেলা ঘর থেকে বেরোতেই দেখে দরজার পাশ থেকে দ্রুত বেগে সরে গেল মঞ্জরি। পালাবার ধরনটা ভালো লাগল না জিতেশের। কিন্তু এ নিয়ে কোনো উচ্চ-বাচ্যও করল না। দিনকয়েক পরে বিকালের দিকে একদিন রান্নাঘরে চা করছিল মল্লিকা। মঞ্জরি এসে বলল, অসময়ে চা কেন?

—ঠাকুরপো খাবে।

—কোথায় সে?

—আমার ঘরে বসে আছে।

—চা তো সে বরাবর নীচে এসেই খায়। আজ তোমার ঘরে কেন?

—তা তো জানি না। চাইল খেতে। করে নিয়ে যাচ্ছি এক কাপ।

পেয়ালা হাতে চলে যাচ্ছিল মল্লিকা। মঞ্জরি ডাকল, শোনো—

মল্লিকা ফিরে দাঁড়াল। মঞ্জরির কণ্ঠ থেকে উপচে উঠল বিষ, একটাকে খেয়ে পেট ভরেনি, ঐ কাঁচটাকেও চিবিয়ে খেতে শুরু করেছ!

—তার মানে? শান্ত কিন্তু তীক্ষ্ম কণ্ঠে জানতে চাইল মল্লিকা।

—এই সোজা কথাটার মানে বোঝো না, এতটা কচিখুকী তো তুমি নও, বৌ।

মল্লিকার চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভ্রূ যুগলে দেখা দিল ঘৃণার কুঞ্চন। সংযত এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ছিঃ! এত নোংরা মন তোমার, ঠাকুরঝি!

উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে উঠে গেল উপরে। মঞ্জরি চেয়ে রইল জ্বলন্ত চোখ মেলে। তার মধ্যে যতখানি ক্রোধ, তার অনেক বেশি বিস্ময়।

জিতেশের চা খাওয়া হয়ে গেলে মল্লিকা সহজ ভাবেই বলল, আমার ঘরে আর তুমি এসো না, ঠাকুরপো।

জিতেশ বিস্ময়ে বলে উঠল, কেন?

—সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, ভাই। আমি বলতে পারবো না।

—তোমাকে বলতে হবে না, বৌদি। আমি বুঝেছি।

সেই দিন দুখানা চিঠি গেল মতীশের কাছে। জিতেশ লিখল; তোমার বৌকে তুমি নিয়ে যাও দাদা। আমাকে শীগগিরই দিল্লী যেতে হচ্ছে।

মল্লিকা লিখল, ওগো তুমি একবার এসো। আমি আর থাকতে পারছি না। ✓

এলাহাবাদে গিয়ে দুপুরে চাকরি, আর সকালে বিকালে বাড়ি খোঁজা—এই ছিল মতীশের রুটিন। শুধু বাড়ি নয়, সেই সঙ্গে একটা টিউসান্। শ'দেড়েক টাকার ভেলায় চড়ে সংসার সমুদ্রে অবতরণের সাহস করা যায় না। মল্লিকাকে সকল রকম দুঃখ এবং দৈন্য থেকে রক্ষা করতে হবে। দিদির বাড়িতে সে অভাবের মধ্যে মানুষ হয়নি। তার চিহ্ন রয়েছে তার দেহের অটুট স্বাস্থ্যে এবং অপরূপ লাবণ্যে। মল্লিকাদের সেই ছোট্ট গ্রামখানির সঙ্গে মতীশের পরিচয় স্বল্পক্ষণের। তবু যে সামান্য ক'টি মানুষ তার দেখবার সুযোগ হয়েছিল, তাদের দেহে বস্ত্রের স্বল্পতা যতই থাক পুষ্টির দীনতা চোখে পড়েনি। একদল উলঙ্গ এবং অর্ধোলঙ্গ ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে ধরেছিল, 'কলকাতার বাবু' নামক আজব জীবটিকে দেখবার জন্যে। তাদের চাল-চলনে চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি সরল নিরাভরণ স্নিগ্ধতা। প্রবীণদের সঙ্গে আলাপ করে এটা বোঝা গিয়েছিল, ও দেশের ক্ষেতে আছে ধান, খালবিল পুকুরে আছে মাছ, গরুর বাটে দুধ এবং আম কাঁঠাল বাতাবী নারিকেলের বনে অজস্র ফল। যশোর জেলার কোন্ দূর দুর্গম পল্লী প্রান্তে এই জঙ্গলে ঘেরা গ্রামখানি তার শ্যামলশ্রী নিয়ে মতীশের মনের একটা কোণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। একথা সে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, এই গ্রামের কোলেই একদিন কুঁড়ি হয়ে দেখা দিয়েছিল তার মল্লিকা, এরই আকাশতলে, এরই বাতাসের ছোঁয়া লেগে দিনের পর দিন তিলে তিলে মেলে ধরেছিল তার রূপ-মাধুরীর সহস্র দল। সেখান থেকে উপড়ে এনে এই মমতাহীন রুক্ষতার মধ্যে কি দিয়ে তাকে বাঁচাবে, এই তার একমাত্র চিন্তা।

মল্লিকার চিঠির উত্তর দিল মতীশ, আর ক'টা দিন কষ্ট করে থাকো, মল্লি। আমাদের ঘর যে বাঁধা হয়নি। জিতেশকে লিখলো, তোর দিল্লী লাহোর এখন শিকেয় তুলে রাখ। যতদিন আমি না যাচ্ছি, বৌদিকে ফেলে কোথাও গেলে আর রক্ষা রাখবো না।

আরো মাসখানেক চেষ্টার পর একটা ছোট বাসা পাওয়া গেল এবং সেই

সঙ্গে জুটল একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হিসাব লেখার কাজ—সন্ধ্যাবেলা দুঘন্টা। মতীশের মনে হল তার মত ভাগ্যবান্ কেউ নেই। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এল কলকাতায়। এসেই শুনল, পিসীমার মেয়ে গীতার বিয়ে। মা বললেন, ও'র প্রথম কাজ। অনেক ঘটা হবে। বারবার করে বলে গেছেন, নতুন বৌকে যেতেই হবে। না গেলে ভালো দেখায় না। অগত্যা মতীশকে রাজী হতে হ'ল।

সেইদিনই বিকাল বেলা শাশুড়ীর ঘরে ডাক পড়ল মল্লিকার। গিয়ে দেখে নিক্তি আর মোটা খাতা নিয়ে বসে রয়েছে গাঙ্গুলী বাড়ির পুরোনো সেকরা মতিলাল। সামনে কয়েকখানা গয়না। সুহাসিনী দেবী বললেন, তা হ'লে ঐ কথাই রইল, মতি, ব্রেসলেট আর ওপর হাতের মাপটা নিয়ে নাও। চুড়ির মাপ আর নিতে হবে না। একটা চুড়ি খুলে নিলেই হবে। জিনিস কিন্তু আমার সোমবারের মধ্যেই চাই। মল্লিকার দিকে ফিরে বললেন, তোমার একটা চুড়ি খুলে দাও বৌমা।

মল্লিকা চুড়ি খুলে রাখল শাশুড়ীর সামনে। সেকরা উঠে এসে তার বাহুর উপর একটা জড়োয়া আর্মলেট রেখে বলল, এটাই ঠিক হচ্ছে, মা। খাসা মানিয়েছে, দেখুন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে বলল, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মতো বৌ আপনার। সাজান না কত সাজাবেন।

সন্ধ্যাবেলা বড়বাজার থেকে বেনারসীর বোঝা নিয়ে এল কস্তুরলাল। দোতলার হলঘরে একশ' পাওয়ারের আলো জেবলে মা আর মেয়েতে মিলে ঘন্টাখানেক চলল বাছাবাছি। তারপর মল্লিকাকে ডেকে পাঠানো হ'ল। দোকানী একটিবার তার দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, রঙ পছন্দ্ আর দরকার হোবেনা, মা। বহুমাকে সব রঙ মানিয়ে যাবে। এই নিন, বলে মল্লিকার দিকে এগিয়ে দিল চার পাঁচখানা দামী জমকালো শাড়ি।

রাত এগারটায় মল্লিকা যখন শুতে এল, মতীশ বলল, অনেক কাপড় গয়না পেলে নাকি শুনলাম ?

—হিংসা হচ্ছে বুঝি তোমার, মুখ টিপে হাসল মল্লিকা।

মতীশ সে হাসিতে যোগ দিলনা, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। মল্লিকা এগিয়ে এসে ডানহাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আহা, রাগ করছ কেন ? তোমাকেও কিছু ভাগ দেবো। এবার খুশি তো ?

ম্লান হাসি হেসে বলল মতীশ, খুশি হবারই তো কথা। কিন্তু তুমি

তো জান না, মল্লি, এ গয়না কাপড় তোমার জন্যে আসেনি, এসেছে গাঙ্গুলী বাড়ির মান রক্ষার জন্যে।

মল্লিকার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। স্বামীর আর একটু কাছে সরে এসে বলল, এ বিয়েতে যেতে কেমন যেন ভয় করছে, আমার। তার চেয়ে চল না, আমরা আগেই চলে যাই। বাবা মাকে বুঝিয়ে বললে ও'রা নিশ্চয়ই জোর করবেন না।

—বুঝিয়ে বলেছি। ও'রা শুনবেন না। কিন্তু; না, না—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল মতীশ, বিয়েতে তোমাকে যেতেই হবে। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আমরা মারবো। ঐ বেনারসী আর জড়োয়ার অস্ত্র। ঐগুলো পরে, রানীর মতো মাথা উ'চু করে, একবার তুমি গিয়ে দাঁড়াও ঐ হিংসুটে কুচক্রী ছোটলোক গুলোর মধ্যে। ওরা চেয়ে দেখুক; দেখে জ্বলে পুড়ে মরুক। ওদের সেই জ্বালা আমি একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

স্বামীর পাশে বসে মল্লিকা তার বুকের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ মানুষটির বুকের মধ্যে এতখানি আগুন লুকিয়ে ছিল, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কোনোদিন।

নতুন বৌকে সাজাবার ভার নিল মঞ্জরি। একদিন এসব আর্টে নাকি তার জুড়ি ছিল না। আজ কপাল পুড়েছে বলেই সাধ আহ্লাদ তো আর নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রসাধন পর্বের প্রথম অংক হল স্নানঘর। সেখান থেকেই শুরু। নিপুণ হাতে সাবান লেপনের পর মুখে কপালে যখন শুরু হ'ল শুষ্ক তোয়ালের নির্মম ঘর্ষণ, মল্লিকা আর মুখ না খুলে পারল না—আর কত ঘষবে, ঠাকুরঝি। এক পরতা চামড়াই বোধহয় উঠে গেল এতক্ষণে।

মঞ্জরি জবাব দিল তার স্বভাবজ মধুর কণ্ঠে, অঢেল আছে কিনা, তাই এত দেমাক, এত হেলা ফেলা। দ্যাখ্ চোখ খুলে, কি ময়লাটা উঠছে। একচোখো বিধাতার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিয়েছে। এত রূপ, তার একটু যত্ন নেই! একগাদা তেল কালি মেখে ভূত সেজে বসে আছে। পড়তিস সেরকম লোকের হাতে—

পরিহাস-তরল কণ্ঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মল্লিকা। থেমে গেল ননদের দিকে চেয়ে। হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে গেছে মঞ্জরি। তার নির্নিমেষ চোখদুটি তারি সিক্ত দেহের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু সেখানে তারা থেমে নেই।

ভেদ করে চলে গেছে হয়তো কোনো স্মৃতি-মুখর অতীত দিনের আলোয়, যার খবর মল্লিকা জানে না।

গয়না পরাতে গিয়ে বিরক্তি ফুটে উঠল মঞ্জরির মুখে। এই রকম নেকলেস কি আজকাল কেউ পরে? মার যেমন পছন্দ! আর এই বুঝি ব্রেসলেট! দূর।—বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিজের গয়নার বাক্স খুলে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তাকাল নিজের দিকে। বোধহয় মনে পড়ল সেই মঞ্জরিকে যার সর্বদেহে একদিন এরা ছিল প্রাণময় জ্যোতি। আজকার মঞ্জরির কাছে এগুলো শুধু নিষ্প্রাণ স্বর্ণপিণ্ড। ক্ষীপ্র হস্তে কয়েকখানা অলংকার বেছে নিয়ে ফিরে এল মল্লিকার কাছে। নিপুণ হাতে চলল অঙ্গ-সজ্জা। এক-একটা স্তর পার হয়, আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক থেকে দেখে, মৃৎশিল্পী যেমন করে দেখে তার হাতের গড়া দেবীমূর্তি। দীর্ঘ প্রসাধন পর্ব যখন শেষ হ'ল, কাছে এসে বৌএর রক্তাভ কপোলের উপর আলগোছে একটি ছোট্ট চুম্বন রেখে বলল, দাদার হয়ে একটিনি করলাম একটু-খানি—বলেই হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো। মল্লিকা বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল তার এই দুর্বোধ্য দুর্মুখ ননদটির দিকে।

জিতেশ বাড়ি নেই। ক'দিন হ'ল তার ক্রিকেট টিম্ নিয়ে খেলতে গেছে দিল্লী। বাড়িতে আর চারটি প্রাণী। একখানা গাড়িতেই চললেন সবাই। যাবার আগে গোপন ষড়যন্ত্র হল মতীশ আর মল্লিকায়, শেষ পর্যন্ত ওদের থাকা চলবে না। ঘণ্টা দুয়েক পরেই মল্লিকার ভীষণ মাথা ধরবে কিংবা গা বমি করবে, এবং মঞ্জরির সাহায্যে মতীশের উপর ভার পড়বে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার। ওরা ট্যাক্সি করে ঘুরবে। দেখবে আলোকোজ্জ্বল কলকাতার বিচিত্র রূপ। তারপর বাড়ি ফিরবে অনেক রাতে। আর দুদিন পরেই তো চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। কবে ফিরবে, কে জানে? মল্লিকা উৎসাহিত হয়ে উঠল, বেশ হবে, কিন্তু। সত্যি, কলকাতার কত গল্প শুনেছি ছেলে-বেলা থেকে। একদিনও ভালো করে দেখা হ'ল না। মতীশ ভার নিয়েছে, সে ক্ষোভ তার মিটিয়ে দেবে এক রাতেই। এ সব ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সে বিষয়ে ওদের সন্দেহ কম ছিল না। পিসীমা যদি ছাড়তে না চান, মা যদি বেঁকে বসেন, মঞ্জরি যদি সাহায্য না করে—এর সবগুলো সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু একটা আকস্মিক ঘটনায় ওদের পথ সুগম হয়ে গেল।

তিনতলার একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে নিমন্ত্রিতা মেয়েরা জড় হয়েছেন। অত্যুজ্জ্বল তড়িতালোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জ্বলছে রূপ আর বেশভূষার চমক। কনেও আছে তাদের মধ্যে। বরপক্ষের একটি বর্ষীয়সী মহিলা ঘরে ঢুকলেন, কই, আমাদের বৌ কই, মা-লক্ষ্মী কই গো? একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন মল্লিকার কাছে, এই বুঝি? বাঃ, মেয়ে সুন্দর, শুনেছি। এত সুন্দর! এ যে স্বয়ং মা-দুর্গা গো। মুখখানা দ্যাখ; একেবারে ঠাকুর দেবতার মুখ...

মল্লিকা বিব্রত হয়ে পড়ল। লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না। তবু বুঝতে পারছে, চারদিক থেকে সবগুলো চোখই তার উপর উদ্যত এবং তাদের কোনোটাই প্রসন্ন নয়। এমন সময় কে একজন তাকে রক্ষা করল।

—এই যে কনে, এই দিকে আসুন ঠাকুরমা, বলে কাণ্ডজ্ঞানহীনা বৃদ্ধার হাত ধরে নিয়ে গেল আসল কনের কাছে। তিনি স্পষ্টতঃ নিরাশ হলেন। খবরটা যখন কনের মায়ের কানে পেঁছল, তিনি হলেন ক্ষিপ্ত। কী দরকার ছিল মাঝখানে জাঁকিয়ে বসবার? রূপ না হয় আছে; তাই বলে এতখানি দেমাক কিসের? এসেছো তো বাপু কোন্ হাড়ফুটোর ঘর থেকে। বাসন মেজে মেজে হাতে কড়া পড়ে গেছে।—ইত্যাদি মধুর বাক্যের গুঞ্জরন উঠল ঘরে ঘরে এবং তার সবটুকুই এসে পেঁছল মল্লিকার কানে। সুতরাং মাথাটা তার সত্যিই ধরল এবং চলে যাবার প্রস্তাবে একবাক্যে সম্মতি দিলেন স্নেহময়ী অভিভাবিকার দল।

প্রকাণ্ড একখানা নতুন ক্রাইসলার গাড়ি। গম্ভীর হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেছে চৌরঙ্গীর বুকের উপর দিয়ে। স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে পিছনের সিটে যখন ডুবে গেল মল্লিকা, তার মনে হতে লাগল সেই একটি মাত্র কথা, এত সুখ তার সইবে তো? মতীশের জীবনেও কোনোদিন আসেনি এমনি ধারা উচ্ছ্বল মুহূর্ত। তার মনে জেগেছে উৎসবের জোয়ার। এ যেন তারই বিবাহ-রাত্রি। রূপৈশ্বর্য-মণ্ডিতা যে অগ্নিশিখার উত্তপ্ত স্পর্শ জড়িয়ে আছে তার অঙ্গে, সে যেন তার সদ্যলব্ধা নববধূ। মল্লিকা যেন আজই প্রথম এসেছে তার জীবনে। তাকে সে আরো একান্ত, আরো নিবিড় করে পেতে চায়। হঠাৎ একসময়ে দুখানা মুখের ব্যবধান যখন অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে এল, মল্লিকা আস্তে ঠেলে দিল স্বামীকে, ফিস্ ফিস্ করে বলল, দেখছে যে লোকটা।

—ওর পেছনে দুটো চোখ আছে নাকি?—তেমনি চুপি চুপি বলল মতীশ।

—বাঃ; বুঝতে পারে তো!

কিন্তু এসব কোনো যুক্তিই টিকল না। ব্যবধান ঘুচে গেল। তার জন্যে কোনো সত্যিকার আপত্তিও দেখা গেল না মল্লিকার তরফ থেকে। ঘন্টা তিনেক ঘুরে আমহার্স্ট স্ট্রীটে যখন এসে পেঁছল, তার আগেই বেশ জোরে জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ওদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করানো হ'ল। মতীশ দরজা খুলে নেমে পড়ল। মল্লিকাও নামতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বলল মতীশ, দাঁড়াও, দরজা খুলুক আগে। ভিজে ঢোল হয়ে যাবে যে।

—তা হোক্; আমি নামবো, আবদারের সুরে বলল মল্লিকা। ততক্ষণে গাড়ির দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেছে মতীশ। ফুটপাথ পার হয়ে কড়া নাড়তে যাবে, হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার শুনে পেছন ফিরে দেখে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে।

রোখো, রোখো, এই ড্রাইভার! চোর! চোর! পাকড়ো, ট্যাক্সি!—উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটল মতীশ। ততক্ষণে তার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বিদ্যুৎ বেগে মিলিয়ে গেছে ট্যাক্সি। রাস্তায় জনমানব নেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু সাক্ষীগোপালের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে ল্যাম্প্-পোস্টগুলো। মতীশ বাড়ি ফিরল না। মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল সারারাত। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে ভোরবেলা গেল থানায় খবর দিতে। গাড়ির নম্বর জানা নেই। কি গাড়ি তাও বলতে পারল না। পাঞ্জাবী ড্রাইভার, এইটুকু তথ্য শুধু জানতে পারলেন থানা অফিসার।

পরদিন বেলা আটটার সময় একখানা রিক্সা করে যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন আর চলবার শক্তি নেই। টলতে টলতে বসে পড়ল উঠানের পাশে। মা ছুটে এলেন, কোথায় ছিলি সারারাত! একি চেহারা হয়েছে ছেলের! বৌমা কই?—কী জবাব দেবে মতীশ। হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে একবার শুধু বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, মা। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কর্তার এক বন্ধু ছিলেন পুলিসের উচ্চ মহলে। ট্যাক্সি করে ছুটলেন তার কাছে। থানায় থানায় সাড়া পড়ে গেল। শহর এবং শহরতলিতে শুরু হ'ল সন্ধান। টেলিগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। প্রত্যাশিত খবর এসে পেঁছিল না।

তৃতীয় দিন ভোর বেলা ঝি আসছিল কাজে। চারদিক তখনো ফর্সা হয়নি। বাইরের রোয়াকে ঝুঁকে পড়ে কি একটা দেখছে দুজন উড়ে মিস্ত্রী; হাতে তাদের রাস্তায় জল দেবার হোজ-পাইপ।

—কী গা? হেঁকে বলল ঝি।

—একটা মেয়েছেলে। একখানা ট্যাক্সি এসে ফেলে চলে গেল।

এগিয়ে গিয়ে একপলক দেখেই চেঁচিয়ে উঠল কালীদাসী—ওমা! এ যে আমাদের বৌ দিদিমণি!

ধরাধরি করে ওর নিজের ঘরে তোলা হল বৌকে। নিরাভরণ দেহ। আবরণও নেই বললেই চলে। একটা নোংরা ধুতি কোনো রকমে জড়ানো। মতীশ আছড়ে পড়ল সংজ্ঞাহীনার বুকের উপব। চিৎকার করে ডাকল, মল্লি, মল্লিকা। কেউ সাড়া দিল না।

খবর পেয়ে ডাক্তার এলেন। মোটামুটি পরীক্ষা করে ক্ষীপ্র হস্তে লিখলেন প্রেসক্রিপশন। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবে। তারপর কর্তার ঘরে গিয়ে বললেন, Physical injury যেটা হয়েছে, তার জন্যে ভাবি না। কিন্তু nerve-এর shock কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। Treatment তো আছেই। তার চেয়েও বেশী দরকার long and patient nursing. দরদ এবং সেবা। দু'দিন একদিন নয়, বোধহয় কয়েক মাস।

ঘর ভর্তি লোক। সবাই নিস্পন্দ। নিঃশব্দে চেয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল মঞ্জরি। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সেজন্য ভাববেন না ডাক্তার কাকা। আমার তো কোনো কাজ নেই। ও-ভার আমি নিলাম।

—তুমি কি পারবে, মা? সন্দেহের সুরে বললেন বৃদ্ধ ডাক্তার।

—কেন পারবো না?

—ওটা তো আনাড়ি হাতের কাজ নয়। নার্সিংএর জন্যে প্রাণ চাই, নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সঙ্গে চাই ট্রেনিং।

কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হ'ল, বৌকে আপাততঃ কোনো নার্সিং হোমে পাঠানো হবে। সেখানে তার ভার নিয়ে থাকবে দু-জন সুদক্ষ নার্স। অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

প্রথম যেদিন জ্ঞান হ'ল মল্লিকার, চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল চারদিকে। বোধহয় মনে করতে চেষ্টা করল সব কথা। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি কোথায় ?

মতীশ কাছেই ছিল। ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, তুমি আমার কাছে আছ, মল্লি।

—তুমি! না-না, ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মল্লিকা, সরে যাও। আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁতে নেই—

—সে কি কথা মল্লি, ওকে জড়িয়ে ধরে বলল মতীশ, আমি, আমি! আমার কাছে রয়েছ তুমি।

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। আমি অশুচি, অস্পৃশ্য। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চিৎকার শুনে ছুটে এল সিনিয়র নার্স মিস্ সরকার। বিরক্তির সুরে বলল, করছেন কি! ছেড়ে দিন ওকে।

মতীশ অপরাধীর মতো উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ উত্তেজনার পর ক্লান্ত, অসাড় হয়ে চোখ বুজল মল্লিকা। নার্স তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পাল্‌সে হাত রাখল।

মতীশের উপর কড়া হুকুম জারি হ'ল, ডাক্তারের অনুমতি যতদিন না মেলে, মল্লিকার ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। তবু বিকেল হলেই নার্সিং হোমের আফিসে গিয়ে ধর্ণা দেয়, মিস্ সরকারের সঙ্গে দেখা করে, জিজ্ঞেস করে, কেমন আছে আজ। উত্তর প্রায় একই—একটু ভালো কিংবা আগের মতই। এমন সময় এলাহাবাদ থেকে চিঠি এল—আর ছুটি দেওয়া হবে না। অবিলম্বে জয়েন না করলে, তারা অন্য লোক দেখে নেবে। উত্তরে তৎক্ষণাৎ ইস্তাফা পত্র লিখে ফেলল মতীশ। তারপর কি ভেবে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলে দিল। মনে পড়ল মল্লিকার সেই কথাগুলো—'চল আমরা এ-বিয়ের আগেই চলে যাই। বাবা মাকে বুঝিয়ে বললে ও'রা নিশ্চয়ই জোর করবেন না।' ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন এখনো তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

মঞ্জরি রোজ একবার করে যায় নার্সিং হোমে। সেদিন ওকে একটু সুস্থ দেখে বলল, দাদাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস কেন রে? পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে বেচারা।

মল্লিকার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। বলল, ওকে তুমি দেখো, ভাই।

—আমি দেখবো! মানে? তুই কি বাড়ি-টাড়ি যাবি না নাকি? কদ্দিন আর এই হাসপাতালে শুয়ে থাকতে চাস, শুনি?

—বাড়ি যাবার পথ তো আমার আর নেই, ঠাকুরঝি।

—সে আবার কী কথা!

মল্লিকা একটু চুপ করে থেকে বলল, যা হারিয়েছি, তার চেয়ে বড় মেয়েমানুষের আর কী আছে, ভাই? সে-কথা উনি না বুঝতে পারেন, মেয়ে হয়ে তুমি তো বোঝো। এই দেহটা কি আর তার পায়ে রাখা যায়, না এ দিয়ে তার সেবা চলে?

মঞ্জরি উষ্ণ কণ্ঠে বলল, দ্যাখ বৌ, তোর এই সব পণ্ডিতি-বুলি শুনলে আমার গা জ্বালা করে। দেহের কথা বলছিস। কিন্তু একে বাঁচাবার কোনো উপায় তো তোর হাতে ছিল না।

—তা ছিল না। কিন্তু তাই বলে, যা ঘটল তার ফলটা তুমি অস্বীকার করবে কেমন করে? ভূমিকম্পে যখন বাড়ি ভেঙে পড়ে, তার ওপরেও বাড়ির কোনো হাত নেই। তবু সেই ভেঙে পড়াটা সত্যি। তার ফলভোগও ঐ বাড়িকেই করতে হয়।

মঞ্জরি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, কি জানি ভাই, তোমার ওসব বড় বড় তত্ত্ব-কথা আমার মাথায় ঢোকে না। আমি মুখ্যু মানুষ, সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, পাপ পুণ্য শুচি অশুচি—এসব বোধ হ'ল মনের। দেহের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? দেহে যদি দাগ লেগেও থাকে, মনকে তা স্পর্শ করবে কেন? সেই জানোয়ারটাকে তো তুই ভালবেসে আত্মদান করিসনি।

—না, ভাই, তা করিনি। তবু দেহের দাগ মনের গায়েও লাগে। শরীরটা যখন বাসের অযোগ্য হয়ে গেল, মন দাঁড়াবে কিসের ওপর? দেহই না মনের আধার?

মঞ্জরির দৃষ্টি ছিল জানালার বাইরে। সেই দিকে চেয়েই মৃদু কণ্ঠে বলল, তোর কথার ঠিক জবাব আমি দিতে পারবো না, বৌ। সে বিদ্যা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, তোর কপালে যা ঘটেছে, সেটা যদি আমার হত, আমি তাকে স্রেফ একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঝেড়ে ফেলে দিতাম। একদিন একটা পশুর হাতে পড়েছিলাম বলে তার দাঁতের বিষ আর নখের আঁচড়টাই আমার জীবনে সত্য হয়ে থাকবে, আর মিথ্যা হয়ে যাবে আমার চিরদিনের দেবতার অমৃত স্পর্শ, একথা আমি কিছুতেই মানতে পারি না।

মল্লিকার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, বৌ, তুই বড় স্বার্থপর। খালি নিজেকে নিয়েই আছিস। নিজের শুচি, নিজের ধর্ম। আর একজনের দিকেও দ্যাখ, আর একজনের কথাও ভাবতে শেখ্।

ক্ষণেক বিরতির পর মল্লিকা বলল, ঐখানেই তো আমার সব দুঃখ, ঠাকুরঝি। উনি যদি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতেন, মুখ ফিরিয়ে নিতেন আমার এই অভিশপ্ত দেহটার দিক থেকে, আমি বেঁচে যেতাম, ভাই। সংসারে সব মেয়ে সারাজীবন দিয়ে চায় স্বামীর ভালবাসা, আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে চাইছি আমার স্বামীর ঘৃণা। কী করলে তা পাওয়া যায় বলতে পারো?

মঞ্জরি কোন উত্তর না দিয়ে রাগ করেই চলে গেল। বাড়ি পৌঁছেই ঝড়ের মতো ঢুকল দাদার ঘরে। তিক্ত কণ্ঠে বলল, পরী দেখে ভুলেছিলে; এবার বোঝো! বুনোপাখী ঘরে এনে রাখলেই কি পোষ মানে, না কোনোদিন আপনার হয়!

সেই রাত্রেই মতীশ এলাহাবাদ চলে গেল।

নার্সের সঙ্গে রুগীর যে সম্পর্ক, সেটা যে কখন ওরা নিঃশব্দে পার হয়ে এসেছে, মিস্ সরকার বা মল্লিকা কেউ তা টের পায়নি। আজ ওদের সত্যিকার সম্পর্কটা কি, ওরা জানে না। শুধু জানে, ওরা দাঁড়িয়েছে একে অন্যের অন্তরের মুখোমুখি, এবং তার মাঝখানে কোনো অন্তরাল নেই।

সেদিন মঞ্জরি চলে যাবার পর বহুক্ষণ তেমনি অসাড় হয়ে পড়ে রইল মল্লিকা; ডুবে গেল তার অন্তহীন চিন্তার গহন অতলে। মিস্ সরকার কখন এসে তার শয্যার একটা কোণ দখল করেছে, জানতেও পারেনি। জানতে পারল, তার ডান হাতখানা যখন পড়ল এসে ওর হাতের উপর। চমকে উঠে বলল, ও মা! তুমি কখন এলে? মিস্ সরকার সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, মঞ্জরি দেবী ঠিকই বলেন, দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে অনেক কিছু ভুলতে হয়।

—ভুলতে যে পারি না, ভাই।

—আমি কেমন করে ভুললাম?

—তুমি!

—হ্যাঁ, এই আমি।

মল্লিকা পাশ ফিরে হাতখানা নার্সের কোলের উপর রেখে বলল, তুমিও কি আমারই মত—

মিস্ সরকার হেসে বলল, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে মিল অনেক; একটু-আধটু অমিলও আছে। আমি যাদের কবলে পড়েছিলাম তাদের মাথায় পাগড়ি ছিল না, তবে মুখে ছিল চাপদাড়ি। প্রয়োজন ফুরোবার পর তারা যখন দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেলেন, তোমার মতো এমনি একটা নার্সিং হোম আমার কপালে জোটেনি, জুটেছিল শুধু একটা গাছতলা। সেখান থেকে নিজের অসাড় দেহটাকে নিজেই টেনে হিঁচড়ে যখন ঘরে নিয়ে গেলাম, তখন জুটল গলাধাক্কা।

—বলকি! চমকে উঠল মল্লিকা।

হ্যাঁ। অবিশ্যি গলায় হাত দিয়ে ধাক্কাটা কেউ মারেনি। কিন্তু যা পেলাম তার মানে ঐ দাঁড়ায়। তারপর রইল শুধু পথ। এলাম কলকাতায়। কি করে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না। বারকয়েক হাত বদল হবার পর শেষটায় যখন বেরিয়ে এলাম, একেবারে রীতিমত পাসকরা নার্স। আজ কে বলবে এই রমা সরকারই হচ্ছে সেই নোয়াখালীর এক প্রসিদ্ধ গ্রামের স্বনামধন্য মিত্র-বংশের আদরের মেয়ে অতসি?

—নামটাও বদলে ফেলেছ!

—মানুষটাই যখন রইল না তুচ্ছ নামটা রেখে আর কি লাভ হ'ত, মল্লিকা?

মল্লিকা নিজের মনে কি ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কিন্তু, একটা কথা, দিদি। অনেক কিছু পেরেছ, বুঝলাম। ঘর বাঁধতে তো পারনি।

—ঠিকই বলেছ। কিন্তু, তার কারণ, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। তার কারণ, ঘর থেকে বাইরে নেবার অনেক সঙ্গী জুটলেও, ঘর বাঁধবার সঙ্গী আজ পর্যন্ত একটাও আসেনি।

—তেমন সঙ্গী যদি পাও, তোমার দিক থেকে মনে-প্রাণে পারবে তার ঘর করতে?

—কেন পারবো না?

মল্লিকা করুণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি যে পারছি না, ভাই। আমার দেবতার মতো স্বামী। তার মুখের দিকে চাইলে আমার বুক ফেটে যায়। তবু তো পারি না তার ডাকে সাড়া দিতে?

মল্লিকার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। নিজের আঁচলে সস্নেহে মুছিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল মিস্ সরকার, আমি সব জানি বোন। কিন্তু তোমার ঐ পুঁথির বুলি তোমাকে ভুলে যেতে হবে। তুমি অনেক পড়েছ, অনেক শিখেছ। সে সব শুধু বোঝা। জীবনের মাঝখান থেকে যখন টান আসে, ওগুলো কোনো কাজেই লাগে না। ওসব ঝেড়ে ফেলে তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়।

মল্লিকা বলল, না দিদি, তুমি ভুল করছ। লেখা-পড়া যাকে বলে, আমি তা কোনোদিন শিখিনি। পাড়াগাঁয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে মানুষ। একটু বাংলা, একটু সংস্কৃত। সেসব আমার মনেও নেই। জীবনে যদি কিছু পেয়ে থাকি, পুঁথির কাছ থেকে পাইনি, পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে। আমার ভেতরে যা-কিছু দেখছ, সব ঐ একটি মাত্র মানুষের দান।

—কে তিনি ?

—আমার কৈশোর-গুরু, আমার দিদির স্বামী।

ঝি এসে জানাল ডাক্তারবাবু মিস্ সরকারকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নার্স যেতে যেতে বলল, এবার উঠে মুখ হাত ধুয়ে নাও। তোমার খাবারটা এখানেই দিতে বলি।

মল্লিকা যেন শুনতেই পেল না কথাগুলো। তার দু-কান ভরে বাজতে লাগল যাদব তর্করত্নের স্নেহ-গভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। মনে পড়ল, কি একটা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, এই যে মানব-দেহ আমরা ধারণ করেছি, একে তুচ্ছ মনে কোরো না, মল্লিকা। দেহ হচ্ছে দেবতার মন্দির। একে শুচি, শুদ্ধ পবিত্র রাখলেই তার মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ। আজ হোক, কাল হোক একদিন তোমাকে পতিবরণ করতে হবে। স্বামী হয়ে যিনি আসবেন, তোমার এ দেহ-মন যেন তার পায়ে শুদ্ধভাবে সমর্পণ করতে পার, যেমন করে আমরা নিবেদন করি দেবতার পায়ে পুজোর ফুল। মনে রেখো, মল্লিকা, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক ফুলই দেবভোগ্য। যে-ফুল আঁস্তা-কুড়ে পড়েছে, যাকে কেউ পায়ে মাড়িয়ে গেছে, সে কখনো দেবতার পুজোয় লাগে না।

কথাগুলো মল্লিকার অন্তস্থলে গাঁথা হয়ে গেছে। কে জানত একদিন তার নিজের জীবনেই দেখা দেবে তার মূল্য-পরীক্ষার প্রয়োজন ? কিন্তু প্রয়োজন যখন সত্যিই দেখা দিল, ঘর বাঁধতে না বাঁধতেই যখন ডাক পড়ল

সে ঘর ভাঙবার, সহসা দমকা বাতাসে নিবে গেল তার [illegible] সদ্য-সাজানো দীপমালা, তখন সব কিছু ফেলে সমস্ত শক্তি দিয়ে একেই সে আঁকড়ে ধরল, এই আ-কৈশোর বন্দিত নির্মম কঠিন আদর্শ। মনে মনে বলল মল্লিকা, প্রথম জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে যাকে সত্য বলে জেনেছি, তার মর্যাদা যেন কোনো-ক্রমে ক্ষুণ্ণ না হয়। তার জন্যে যত বড় মূল্য দিতে হয়, দেবো। এই উচ্ছিষ্ট দেহ ত্যাগ করতে হয়, করবো, তবু একে দিয়ে আমার দেবতার পূজা অসম্ভব।

দেখতে দেখতে প্রায় দুমাস কেটে গেল। অনেকখানি সেরে উঠেছে মল্লিকা। নার্সিং হোমের এই সস্নেহ আশ্রয় থেকে বিদায়ের দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছোট্ট খাটখানির উপর শুয়ে সেই কথাই বোধ হয় ভাবছিল। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। অন্যদিন এতক্ষণে সে উঠে পড়ে। আজ যেন কোন তাগিদ নেই। জানালা দিয়ে নিঃশব্দে চেয়ে ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পানে। মিস্ সরকার হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলল, ওমা, তুমি এখনো শুয়ে!

—উঠতে ইচ্ছা করছে না, ভাই।

নার্স মুখ টিপে হাসল, কেন?

—কেমন যেন জোর পাচ্ছি না কদিন থেকে। মাথা তুললেই গা পাক দেয়।

মিস সরকার টেবিলটা গোছাতে গোছাতে বলল, তাই তো দেবে। তুমি খেতে পার আর না পার, আমাদের যে এবার পেট ভবে সন্দেশ খাবার পালা।

একটু থেমে মল্লিকার সন্দিগ্ধ চোখের দিকে চেয়ে বলল, বুঝতে পারছ না! নোটিস টের পাওনি?

চোখ নামিয়ে নিল মল্লিকা। কোথা থেকে এক ঝলক রক্ত এসে পড়ল তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের উপর। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তকাল। পরক্ষণেই, সভয়ে দেখল নার্স, সে-মুখে একফোঁটা রক্ত নেই। যেন একখানা সাদা কাগজ। দুচোখ ভরে উঠেছে কিসের এক গভীর আতঙ্কের ছায়া। চমকে উঠল সরকার। ছুটে এগিয়ে গিয়ে বসল ওর বিছানার পাশটিতে। সহসা তার বুকের উপর ভেঙে পড়ল মল্লিকা, চেঁচিয়ে উঠল আর্তকণ্ঠে, এ আমায় কী শোনালে দিদি! তুমি ঠিক জানো, যে আসছে, সে আমার গর্বের ধন না কলঙ্কের কালি?

নার্সের মুখে এ প্রশ্নের উত্তর যোগাল না। ওকে শুধু বুকে জড়িয়ে ধরে সর্বাঙ্গে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মঞ্জরি এল পরদিন বিকালে। মিস্ সরকারের মুখে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকল এ-ঘরে। চৌকাঠের ওপার থেকেই কলকণ্ঠের চিৎকার—কি গো পণ্ডিত মশাই, তোমার লেকচারের ঝুড়ি এবার শিকেয় উঠলো তো? বাড়ি যাবে না!—এমন অনাছিষ্টি কথা ভগবান কখনো সইতে পারেন? ঘাড় ধরে নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন পেয়াদা। কেমন জব্দ!

কাছে এসে বসতে শুষ্ক কণ্ঠে বলল মল্লিকা, বড্ড ভয় হচ্ছে, ঠাকুরঝি।

—আ মর্! ভয় কিসের! ছেলে যেন ওরই হচ্ছে, আর কারো কোনো-দিন হয়নি।

—না, ভাই, সে কথা নয়—

—থাক্, তোমার কোনো কথাই বলে কাজ নেই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যি, ঠাট্টার কথা নয় বৌ। এবার তুমি আর একা নও। পেটে রয়েছে আমাদের ঘরের ছেলে। গাঙ্গুলী বাড়ির প্রথম বংশধর। তার মান, মর্যাদা আছে, কল্যাণ অকল্যাণ আছে। এই নার্সিং হোমে পড়ে থাকা আর চলে না। বাবাকে বলছি গিয়ে। ডাক্তারকে উনি বুঝিয়ে বলুন।

সে রাতটা মল্লিকার কাটল প্রায় বিনিদ্র শয্যায়। তাকে নিয়ে এ কী কৌতুক বিধাতার! এতদিন যে সমস্যা ছিল, সেইটাই কি যথেষ্ট নয়? তার ওপর এ আবার কী পরীক্ষা! 'গাঙ্গুলী বাড়ির প্রথম বংশধর!' মঞ্জরির মুখে একথা শুনবার পরেও তার সমস্ত বুকখানা কই আনন্দে, গৌরবে ভরে উঠল না তো? অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কুৎসিত সাপের মতো মাথা তুলে উঠল এক বিষাক্ত সন্দেহ। দুলে উঠল তার সমস্ত অস্তিত্ব।

ভোরের হাওয়ায় কখন চোখ বুজে এসেছিল। যখন ঘুম ভাঙল ঘর ভরে গেছে সকাল বেলার কোমল রোদে। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে এসে দেখে জুনিয়র নার্স মীরা তার খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে বলল মল্লিকা, একটু কাগজ কলম দিতে পার, ভাই?

—চিঠি লিখবেন বুঝি?—মুখ টিপে হাসল অল্প-বয়সী মেয়েটি।

মল্লিকা মাথা নাড়ল।

—বড় কাগজ চাই তো?

—হ্যাঁ, বড় কাগজই দিও।

অনেকদিন পরে দিদির কাছে তার এই দীর্ঘ চিঠি। প্রথমে খানিকটা অনুযোগ, অভিমান—আপদ বিদায় করে নিশ্চিন্ত হয়েছ তোমরা। একবার জানতেও চাও না সেটা মরেছে, না বেঁচে আছে। ইত্যাদি। তারপর লিখল—বড্ড ভয় হয়েছিল, দিদি। পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ে। কি চোখে দেখবেন এঁরা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, দেখছি, আমার জন্যেই যেন সবাই পথ চেয়ে বসেছিলেন। যেমনি দেওর, তেমনি ননদ। আর তোমাব ভগ্নীপতিটি? তার কথা আর নাই বললাম।

সকলের শেষে রইল তার চরম সর্বনাশের কথা। সেই দুর্যোগের রাত, নার্সিং হোম, স্বামী, ননদ, মিস্ সরকার এবং এই সমস্যা-জড়িত সন্তানের আবির্ভাব। সব অকপটে এবং সবিস্তারে জানিয়ে লিখল—দিদি ভাই, এবার তোমরা বলে দাও আমি কোন পথে যাবো। । জামাইবাবুর প্রতিটি উপদেশ আমার কাছে অলঙ্ঘ্য গুরু-মন্ত্র। এতদিন তারি আলোতে পথ চলেছি। হঠাৎ ঝড় উঠল। আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আজ এসেছে নতুন নির্দেশের প্রয়োজন। এত বড় প্রয়োজন আমার জীবনে আর কোনোদিন দেখা দেয়নি।

উত্তর এল সাত-আট দিন পরে। দিদির কয়েক লাইন, তার সঙ্গে জামাইবাবুর কয়েক পাতা। কুশল প্রশ্নাদির পর লিখেছেন তর্করত্ন—মানুষের জীবনে ঝড় আসে, আবার কেটেও যায়। যে-ক্ষতি সে রেখে যায়, তার চিহ্নও একদিন মিলিয়ে আসে। ঝড় ক্ষণিকের, কিন্তু সূর্যালোক শাশ্বত ঝড়ের কথা মনে রেখো না, সূর্যকে অর্থাৎ ধ্রুবকে আশ্রয় কর।

তারপর লিখেছেন, তুমি মা হতে চলেছ। এইখানেই তোমার সব প্রশ্ন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন, নারীর পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে মাতৃরূপ। অন্যত্র সে খণ্ডিতা, অসম্পূর্ণা। সন্তানের মধ্যে সে পুনর্জন্ম লাভ করে। তার সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে যায় ঐ ক্ষুদ্র একটি শিশুর সত্তায়। সে তখন ঐ শিশু-দেবতার সেবাদাসী। সেই তার একমাত্র পরিচয়। নিজস্ব বলে তখন আর তার কিছুই থাকে না। তোমার আর কোনো সমস্যা নেই।

চিঠির উপসংহারটি বারে বারে পড়ল মল্লিকা—তোমার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই আমার গুরু-গিরির পালা শেষ হয়ে গেছে, ভাই। এখন তোমার গুরু এবং পথ-নির্দেশক তোমার স্বামী, আমার পরম স্নেহাস্পদ্ মতীশভায়া।

তিনি যা বলেন সেইটাই তোমার মন্ত্র। তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইটাই তোমার তীর্থ।

চিঠিখানা বুকে চেপে ধরে চোখ বুজে রইল অনেকক্ষণ। মনে মনে উচ্চারণ করল—তবে তাই হোক। আর আমি ভাবতে পারি না!

মঞ্জরির চিঠি পেয়ে মতীশ আবার এল কলকাতায়। ভয়ে ভয়ে ঢুকল মল্লিকার ঘরে। দূরত্ব রেখে বসল একটা টুলের উপর। মল্লিকার মনে আবার জেগে উঠল সেই ভয়ংকর প্রশ্ন, যার উত্তর সে জানতে চেয়েছিল মিস্ সরকারের কাছে। কিন্তু স্বামীর উদার সরল স্নেহস্নিগ্ধ চোখদুটির দিকে একবার মাত্র চেয়ে প্রশ্নটি তার মনের মধ্যেই রয়ে গেল। নিজের দেহে প্রথম মাতৃত্বের সূচনা স্মরণ করে তার সদ্য-রোগমুক্ত মুখের উপর ফুটে উঠল একটি লাজ-সুন্দর মৃদু হাসি। দুর্নিবার আকর্ষণে এগিয়ে গেল মতীশ। মল্লিকার একটি হাত নিজের দুখানা হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আমি সব শুনেছি, মল্লি। ডাক্তারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো।

বাড়ির কথা শুনেই বুকের ভিতরটা চমকে উঠল মল্লিকার। ভীত কণ্ঠে বলল, কিন্তু—

—আর কোনো 'কিন্তু' নেই, বাধা দিয়ে বলল মতীশ। সব 'কিন্তু' সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি।

কথাগুলো মল্লিকার কানে এল যেন সুধা-বর্ষণের মতো। সেই সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে উঠল তার গুরুর চিঠির শেষ ক'টি ছত্র। আর কোনো কথাই তার মুখে এল না। শুধু ক্লান্ত হাতখানি এলিয়ে পড়ল স্বামীর কোলের উপর।

এর ক'দিন পরেই গাঙ্গুলী বাড়ির মাথার উপর আবার হ'ল বজ্রপাত। সুহাসিনী দেবী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন। হঠাৎ পড়ে গেলেন মাথা ঘুরে। প্রেশারের খেলা। আগেও দু-একবার ভেলকি দেখিয়ে গেছে। ডাক্তারের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও সাবধান হননি সুহাসিনী, এবার তার ফল ফলল। ছেলেরা বাড়ি নেই। কর্তা আফিসে। মঞ্জরি গিয়েছিল তার রুগ্না শাশুড়ীকে দেখতে। ঝি আর চাকরে মিলে সংজ্ঞালুপ্ত দেহটাকে কোনো

রকমে নিয়ে গেল ঘরে। ডাক্তার এসে যা করবার করলেন। কিন্তু স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা ফিরবার আগেই উনি পেঁাছে গেছেন ওদের নাগালের বাইরে। দিল্লী লাহোর ক্রিকেট পিটিয়ে ঘুরছিল জিতেশ। খবর পেয়েই এসে পড়ল। দেখল এবং শুনল সব। তারপর সোজা গিয়ে হানা দিল মল্লিকার নার্সিং হোমে।

—বৌদি!—দরজার বাইরে থেকেই সেই দরাজ গলার ডাক। ধড়মড় করে উঠে বসল মল্লিকা।

—তুমি এখনো বিছানায় পড়ে আছ!—বিনা ভূমিকায় কঠোর প্রশ্ন।

—না, ভাই। এই তো উঠে বসেছি।

—তারপর; যাচ্ছ কখন?

—কোথায়?

—কোথায় মানে? তোমার মতলবটা কি খুলে বল দিকিন, বৌদি। মা তো দিব্যি পাড়ি দিলেন। এদিকে ছোড়দির সমন এসে গেছে তার শ্বশুর-বাড়ি থেকে। শাশুড়ী বুড়ী নাকি যায় যায়। আমাদের কি শেষটায় গুষ্টী-সুদ্ধ বেঘোরে মারতে চাও? বেশ, কর যা খুশি। আমার কি? মুখ্যু মানুষ, ব্যাট্ ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়বো একদিকে। কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষটাকেই বা দেখে কে, আর তোমার ঐ নাবালক বি-কম্-টিকেই বা কে সামলায়?

মল্লিকা নিবিষ্ট মনে ভাবছিল। দু মিনিট অপেক্ষা করে আবার হুঙ্কার দিল জিতেশ, ভাবছ কি! উঠবে, না ঘাড়ে তুলবো?

—বাব্বা! ছেলে একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন।

—ঘোড়ায় নয়, মোটরে। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এটা তোমার যশোর নয়, সুসভ্য কলকাতা শহর। বৌরা এখানে ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না, মোটরে চড়ে যায়।

—যাও বাপু, নিয়ে এসো তোমার মোটর।

—বাঃ, একেই তো বলে লক্ষ্মী মেয়ে। নাও, চটপট গুছিয়ে নাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।

বলে, গাড়ি আনতে বেরিয়ে গেল।

নিজের হাতে সংসার তুলে নিল মল্লিকা। ঠাকুর রয়েছে। সে শুধু নামমাত্র। বেশীর ভাগ রান্নাগুলোই তাকে করতে হয়। যেদিন না পারে, কর্তা এটা হয়নি, ওটা হয়নি বলে অনুযোগ করেন, আধপেটা খেয়ে চলে যান আফিসে। খাবার সময় সামনে গিয়ে বসতে হয়। শ্বশুর গম্ভীর মানুষ। কথাবার্তা বড় একটা বলেন না। কিন্তু মল্লিকা বুঝতে পারে তাঁর মনের কথা। একদিন বলেও ফেললেন, জানো বৌমা, আমি ছিলাম মায়ের একমাত্র ছেলে। মা কাছে এসে না বসলে একদিনও খাওয়া হ'ত না। বুড়ো বয়সে আবার বুঝি সেই অভ্যাস ফিরে এল।

জিতেশ আসে তার ক্রিকেট বন্ধুদের দলবল নিয়ে। যখন তখন 'বৌদি' বলে হাঁক দেয়। অসময়ে চায়ের ফরমাশ করে। আর মাঝে মাঝে আসে রমা সরকার। মল্লিকা তাকে বসায় নিয়ে তার শোবার ঘরের কোণটিতে। আটকে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রমা হয় তো বলে, এবার উঠি। মল্লিকা বাধা দেয়।

—ডিউটি রয়েছে যে, বোঝাতে চায় নার্স।

—থাক্‌গে ডিউটি। ও ছাই চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

—সর্বনাশ! চাকরি ছাড়লে খাবো কি? তোমার ছেলে হলে যদি আয়ার চাকরিটা দাও, তখন না হয় ছেড়ে দেওয়া যাবে নার্সিং হোম। কিন্তু তার তো এখনো কয়েক মাস দেরি।

মল্লিকা সে কথার জবাব দেয় না। অনেকটা যেন আপন মনে বলে, ঘর নেই, বাঁধন নেই, শুধু ভেসে ভেসে বেড়ানো। এই কি মেয়েমানুষের জীবন!

—কি করবো ভাই। পানসি সাজিয়ে এলোনা তো কোনো রাজপুত্তুর। ভেসে না বেড়িয়ে যাবো কোথায়?

—ও সব বাজে কথা। আসলে ঘরের দিকে মন নেই তোমার।

—হয়তো তাই। এমন অবাধ খোলা মাঠে চরতে পেলে সংসারের জোয়াল কে ঘাড়ে তুলতে চায়, বল?

মল্লিকার হঠাৎ মনে হ'ল কথাটা পরিহাসের সুরে বললেও কেমন একটা করুণ রেশ রয়েছে শেষের দিকে। তার ছোঁয়া ওর মনেও লাগল, এবং তার ছায়া পড়ল ওর মুখের উপর। সেদিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রমা বলল, তবে শোনো, একটা গল্প বলি। গল্পটা আমার পিসতুতো দাদার কাছে শোনা। উনি ছিলেন মস্ত বড় এক রাজার ছেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী। শুধু রাজার

ছেলে নয়, তার ওপরে আবার নামজাদা সিনেমা আর্টিস্ট। তার পর যা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সিনেমা আর তার আশে পাশে যে সব 'এবং' থাকে তাতেই আস্তে আস্তে তাকে গ্রাস করে ফেলল। রাজকুমার আর ঘরে আসেন না। রাজা তখনো বেঁচে। রেগে মেগে ছেলেকে করলেন ত্যাজ্যপুত্তুর, আর বৌরানীকে জোগাতে লাগলেন নিত্যি নতুন শাড়ি জুয়েলারী বই আর গান-বাজনার সরঞ্জাম। একটু নড়তে গেলেই চারদিক থেকে ছুটে আসে চারজন দাসী। এমনি তার খাতির। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হ'ল বৌরানীর। বেলা ন'টার সময় বেড়াতে গেলেন প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাড়ি। একশ' টাকার চাক্‌রে। আমার বৌদিটি তখন কোমরে আঁচল বেঁধে মাছ ভাজছেন তার সেই রান্না-ঘর নামক খুপরির মধ্যে। ময়লা কাপড়ে হলুদের ছোপ। সর্বাঙ্গে ঘাম আর কালিঝুলি। আমার দাদা ছুটে এলেন তার হাতল-ভাঙা চেয়ার ঘাড়ে করে। সেদিসে ভ্রূক্ষেপ না করে বৌরানী সোজা গিয়ে উঠলেন ঐ রান্নাঘরের দরজায়। বৌদি শশব্যস্তে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখানে আপনার কষ্ট হবে। ও-ঘরে চলুন।' 'তা হোক। এইখানেই বসি। আপনি রান্না করুন'—বলে নিজেই একটা পিঁড়ি টেনে নিলেন। মাছ ভাজা চলল। ঘরময় ধোঁয়া। বৌরানী বারবার চোখ মুছছেন। বৌদি আবার বললেন, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনার।' সেকথা বোধহয় ওঁর কানে গেল না। সেই কালি-মাখা ঝুলে-ভরা অন্ধকার খোপটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'এরকম একটা রান্নাঘরও যদি পেতাম!'...

যাক্; এবার আমি চলি, বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল মিস্ সরকার।

মঞ্জরি গেছে শ্বশুরবাড়ি। সাত-আট দিন পরে কখনো কখনো এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। মল্লিকা দুদিন জোর করে ধরে রাখে। তার প্রিয় রান্নাগুলো রেঁধে খাওয়ায়। মঞ্জরি বলে, তোর মতলব তো ভাল নয়, বৌ। এই জঙ্গল টঙ্গল খাইয়ে একেবারে বাঙাল বানিয়ে ফেলতে চাস। বলে, আরো খানিকটা মেখে নেয় কুমড়োর ডাঁটা দিয়ে মটর ডাল, কিংবা ধনে পাতা দিয়ে লাউ-এর ঘণ্ট।

সমস্ত দিন খেটে সবার মন জুগিয়ে অনেক রাতে যখন শুতে যায় মল্লিকা, নিঃসঙ্গ শয্যার দিকে চেয়ে মনটা তার হু হু করে ওঠে। বিছানায় না গিয়ে কোনো কোনো দিন কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। নানা খুঁটি-নাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে, তারপর আর রাখতে পারে না নিজেকে—ওগো,

আমার এই সুখের দিনে তুমি কাছে নেই, এ যে আমি আর সইতে পারছি না!

মতীশ লেখে, মল্লি, এতদিন তুমি ছিলে শুধু আমার। বড় ছোট করে, সংকীর্ণ করে পেয়েছিলাম তোমাকে। আজ তুমি সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেছ। তোমাকে নতুন করে, বড় করে পেলাম। আমার এ আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। তোমার থেকে দূরে থেকেও আমি তোমাকে জড়িয়ে আছি। আমি তোমার কাছে যাবো না। তুমি আসবে আমার কাছে। নতুন করে ঘর বাঁধবো আমরা। সেই দিনটির প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।

দেখতে দেখতে মাস এগিয়ে চলল। মল্লিকাকে আবার যেতে হ'ল নার্সিং হোমে। তারপর একদিন হঠাৎ শুরু হ'ল যমযন্ত্রণা, যার হাত থেকে কোনো মায়েরই নিস্তার নেই। সমস্ত রাত যমে-মানুষে টানাটানির পর ভোরের দিকে তার কোলে এল কোলজোড়া খোকা। শ্বশুর এসে গিনি দিয়ে মুখ দেখলেন। মঞ্জরি আর জিতেশ এসে হৈ-হল্লা করল কিছুক্ষণ। সাত আট দিন পরে এল মতীশ। মল্লিকা রাগ করে বলল, এ্যাদ্দিন পরে বুঝি মনে পড়ল! মতীশ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, ঈস্, বড্ড ছোট! খিল খিল করে হেসে উঠল মল্লিকা, ওমা, ছোট হবে না তো পেট থেকে পড়েই ছুটবে নাকি!

মতীশ নিরাশ সুরে বলল, নিয়ে যাবার মতো বড় সড় হ'তে যে এখনো অনেক দেরি!

মল্লিকা বাঁকা চোখে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে, বাবুর বুঝি আর সবুর সইছে না।

দিন কয়েক পরে সকাল বেলা বাচ্চাকে তেল মাখাচ্ছিল ঝি। মল্লিকা পাশে বসে স্নিগ্ধ চোখ মেলে চেয়ে ছিল সেই দিকে। ঝি বলে উঠল, হ্যাঁ গা, ছেলে তোমার কারো মুখই পায়নি। না বাপের, না মার।

বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল মল্লিকার। একথার অর্থ কী! ঝুঁকে পড়ে বেশ করে দেখতে লাগল ছেলেকে। সত্যিই তো। এ কার মুখ!

কি রকম রাঙা হয়েছে, দ্যাখ, আবার বলল ঝি। বড় হলে কালো হবে। মায়ের তো ধার দিয়েও যায়নি, বাপের রঙও পাবে না।

মল্লিকার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। বুকে যেন আটকে গেল নিঃশ্বাস।

চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সেইখানেই। কি হ'ল গো!—বলে ঝি তাড়াতাড়ি ছেলে ফেলে উঠে গেল। ক্ষীপ্র হাতে লেগে গেল মায়ের পরিচর্যায়। খানিকক্ষণ বুকে পিঠে মালিশ করবার পর একটু সুস্থ বোধ করল মল্লিকা। উঠে বসে ঝিকে বলল ছেলেকে তার কোলে তুলে দিতে। ঝি বলতে লাগল, আহা, হোক না কালো, নাই বা হোলো বাপ-মায়ের মতো। বেঁচে থাক্। ব্যাটাছেলের চেহারায় কি আসে যায়? নাও, একটু দুধ দাও। বাছার আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

মল্লিকা দুচোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল তার সদ্য-জাত শিশুর দিকে। তবে কি—

পরদিন ছেলে দেখতে এলেন পিসীমা। সঙ্গে বড়দি। একথা সেকথার পর বললেন ভাইঝিকে, দ্যাখ্ ললিতা, কি রকম গাট্টা গোট্টা দেখতে হয়েছে খোকা। একেবারে পাঞ্জাবী গড়ন,—বলে একটু বিশেষভাবে চোখ টিপলেন। বড়দি বললেন, সেটা আমি এসেই লক্ষ্য করেছি, পিসীমা। তাছাড়া মাথাটা কেমন গোল দেখেছ, আর কত বড়? আমাদের বাড়িতে এরকমটা কারো নেই।

—কি জানি, বাবা। বংশের প্রথম ছেলে বংশের ধারা পাবে, এই তো সবাই আশা করে। তা এ যে একেবারে গোত্তর ছাড়া,—বলে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন পিসীমা। তাহলে আসি, বৌ—বলে বড়দিও তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁর বাঁকা ঠোঁটের হাসিটি মল্লিকার দৃষ্টি এড়াল না।

তাঁরা চলে যাবার পর বহুক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে রইল মল্লিকা। সন্ধ্যা এল। আস্তে আস্তে গভীর হ'ল রাত। সবাই শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না শুধু ওর চোখে। হারিকেন তুলে বারে বারে দেখতে লাগল ঘুমন্ত ছেলের মুখের পানে। যত দেখে ততই দৃঢ় হ'ল মন, হ্যাঁ, ওঁদের কথাই ঠিক। এ ছেলের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে, কিন্তু আত্মার যোগ নেই। এ গাঙ্গুলীবংশের কেউ নয়; তার নামহীন গোত্রহীন অবাঞ্ছিত সন্তান। ভেঙে দিতে এসেছে তার এত দুঃখের গড়া নীড়, এত সুখের সাজানো সংসার। যে-রাতটাকে সে ভুলতে চেয়েছিল, মুছে ফেলতে চেয়েছিল তার জীবন থেকে, তারই কলঙ্ককাহিনী সর্বাঙ্গে লিখে নিয়ে এল এই মাংসপিণ্ড। এরই মধ্যে অনন্তকাল

বেঁচে থাকবে সেই অভিশপ্ত রাত, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেবে তার নারী-জীবনের চরমতম গ্লানি!

বিদ্যুৎ স্ফুরণ হ'ল মল্লিকার দুচোখের নীল তারায়। কানদুটো থেকে ছুটে এল আগুনের হল্‌কা। মাথায় শিরগুলো মনে হ'ল ছুটে বেরিয়ে যাবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে মাথা পেতে দিল স্নানঘরে কলের তলায়। কিন্তু দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বলছে যে অনল-জ্বালা সাধ্য কি জল তাকে ঠান্ডা করে!

একরাশ ভিজে চুল নিয়ে আবার ফিরে এল খাটের পাশে। শিশু কাঁদছে। হারিকেনটা আর একবার তুলে ধরল মল্লিকা। ঈস্! কী কুৎসিত সে বিকৃত মুখ! কী কুশ্রী ঐ কর্কশ কণ্ঠ! দুহাতে কান ঢেকে ছুটে গেল ঘরের কোণে। মাথাটা লুটিয়ে দিল টেবিলের উপর। কিন্তু সে কান্নার হাত থেকে তবুও তার মুক্তি নেই। কেঁদে কাঁকিয়ে যাচ্ছে শিশু। হয়তো এখনই দম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই যাক্— চিৎকার করে উঠল মল্লিকা, সরে যাক্ ঐ অভিশাপ, আমার জীবন থেকে মুছে যাক্ ঐ পাপচিহ্ন!

দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায় মল্লিকা। তার মুখের প্রতি রেখায় ফুটে উঠল এক পাশব জিঘাংসা। তীব্র আরক্ত চক্ষু মেলে মোহাচ্ছন্নের মতো এগিয়ে গেল ঐ জড়পিন্ডটার দিকে। আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এল তার দীর্ঘ তীক্ষ্ম আঙুলগুলো; যেন একদল হিংস্র বৃশ্চিক। তারপর কি যে হ'ল, জানে না মল্লিকা। হঠাৎ খেয়াল হ'ল কান্না থেমে গেছে। ঐ ক্ষুদ্র দেহটা আর ছটফট করছে না। পড়ে আছে নিস্পন্দ নিশ্চল ক্ষুদ্র একখন্ড পাথরের মতো। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল মল্লিকার। কী হ'ল! কাঁদছে না কেন খোকা? ছুটে গিয়ে নিয়ে এল হারিকেন। উঁচু করে ধরল বাচ্চার মুখের উপর। রক্তে ভিজে গেছে শুভ্র সুন্দর শয্যা। এত রক্ত কেন! বিকৃত প্রেতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—এত রক্ত কেন! ওগো, তোমরা ওঠো! দিদি, ডাক্তারবাবু, মীরা, শীগগির এসো—

গভীর রাত্রির বুক চিড়ে ফেটে পড়ল নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ম আর্তনাদ। নার্সের দল ছুটে এল। উপর থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন ডাক্তার। মল্লিকা হেসে উঠল পৈশাচিক হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ, খুন, খুন করেছি আমি। এই দ্যাখ।

হা-হা-হা-হা—হা...সে হাসির আর শেষ নেই।

পরদিন একটার গাড়িতে মতীশের যাওয়া হ'ল না। গৃহিনী বললেন, সমস্ত রাত বকিয়ে মেরেছ ছেলেটাকে। এখন একটু ঘুমোতে দাও।

কাছে এগিয়ে এসে অনুনয়ের সুরে বললেন, হ্যাঁগো, ভেতরে নিয়ে একবারটি দেখা করিয়ে দিতে পার না?

বললাম, ফিমেল ওয়ার্ড যে।

—হোলোই বা ফিমেল ওয়ার্ড। কোন্ অসূর্যম্পশ্যা রাজকন্যারা আছেন সেখানে! তোমাকে দেখে যদি এ্যাদ্দিন অজ্ঞান না হয়ে থাকেন, ওকে দেখে কেউ মূর্ছা যাবেন না।

—আমাকে দেখে কেউ অজ্ঞান হয়নি, বুঝলে কি করে?

—ঈস! অত সস্তা নয়। উল্টোটা হয়েছে কিনা, তাই বল। না, সত্যি; একটা ব্যবস্থা কর। পাগল হোক, আর যাই হোক, মেয়েমানুষ তো? চোখের ওপর দেখলে হয়তো মনে পড়বে।

—ডাক্তাররা সে ভরসা দেন না।

—হ্যাঃ, তোমাদের ডাক্তাররা তো সব জানে!

বিকেল বেলা মতীশকে বললাম, চল, তোমাকে আমাদের রাজত্বটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।

ওর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। আপত্তিও করল না। ম্লান হাসি হেসে বলল, চলুন।

দু-চারটা ওয়ার্ড ঘুরে জেনানা ফাটকের গেটে গিয়ে কড়া নাড়লাম। মানদা এসে দরজা খুলে সেলাম জানাল। ভেতরে ঢুকলাম। মতীশ ইতস্তত করছিল। সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে, মনে হ'ল তার পা দুটো যেন সরছে না। বললাম, দাঁড়িয়ে কেন? এসো!

মেয়েদের সাধারণ ব্যারাক ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সেল-ব্লকের দিকে। মানদা দরজা খুলতেই দেখলাম সামনেকার ঘাসে-ঢাকা ছোট্ট চত্বরটি আলো করে বসে আছে মল্লিকা। অপর্যাপ্ত কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর। একটি মেয়ে-কয়েদি তারই পরিচর্যায় ব্যস্ত। মতীশের বাহু ধরে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম মল্লিকা। ও চোখ তুলে চাইল, ওর সেই আশ্চর্য চোখ। দ্যাখ তো কে এসেছে?—মতীশকে এগিয়ে দিলাম সামনের দিকে। মল্লিকার দৃষ্টি পড়ল তার মুখের উপর। তেমনি শান্ত,

এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি, স্যর। আপনি রক্ষা না করলে আমার আর উপায় নেই।'

সাহেব দুচার লাইন পড়ে কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়, কি লেখা আছে।' শুনতে শুনতে, (এক ফাঁকে লক্ষ্য করলাম) ওঁর মুখের পেশীগুলো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠল, ঘনিয়ে এল গাম্ভীর্যের ছায়া।

বিষয়টা বিস্ময়কর হলেও তখনকার দিনে বিচিত্র নয়। ছেলেটির নাম শশাঙ্ক সেন। চিটাগং কলেজ থেকে বি-এ পাস করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কোনো স্টেশনে একটা চাকরি সংগ্রহ করে। খুব কপাল জোর বলতে হবে। কেন না, প্রথমে আর্মারি রেইড, তারপর আসানুল্লা হত্যা, এত বড় দুটো প্রলয়-কাণ্ডের পর চট্টগ্রামবাসী সেন, রায়, বাঁড়ুয্যেদের সরকারী চাকরি লাভ আর আকাশের চাঁদ পকেটস্থ করা ছিল একই বস্তু। কিন্তু কপাল তাকে খানিকটা দূর এগিয়ে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারল না। চাকরি পাকা হবার পালা যখন এল, সরকারী নিয়মে দরকার একটি পুলিস রিপোর্ট। স্টেশন ডিরেক্টর যথারীতি চিটাগং ডি. আই. বি'র শরণ নিলেন। উত্তরে এমন একটি শেল গিয়ে পড়ল তার টেবিলে, যার একঘায়ে চাকরি পাকা তো দূরের কথা একেবারে ভূমিসাৎ। ডিরেক্টর মশাই লোক ভাল ছিলেন। খতম-নোটিসের সঙ্গে পুলিসের চিঠিটাও শশাঙ্কের হাতে দিলেন। সে দেখল, যে-সব ভয়ানক ভয়ানক ব্যাপারে তাকে জড়িত করা আছে, তার কোনোটার সঙ্গেই এ জন্মে অন্তত তার যোগাযোগ ঘটেনি। যে-সব ভয়ঙ্কর ব্যক্তির উল্লেখ আছে তার অপকর্মের সঙ্গী বলে, তাদেরও সে বহু চেষ্টা করে মনে করতে পারল না। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল শুধু চারটি প্রাণী—বিধবা মা, একটি বয়স্থা বোন আর গোটাদুই অপগণ্ড ভাই, তার এই ক্ষীণ চাকরি-সূত্রটি আশ্রয় করে যারা ঝুলে আছে বিরাট অনশনের গহ্বরের মুখে।

শশাঙ্কের চোখের দিকে চেয়ে ডিরেক্টর সাহেব নোটিসটা আপাতত ফিরিয়ে নিলেন এবং ক'দিনের ছুটি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন দেশে। বললেন, 'ওদের গিয়ে ধরো। দ্যাখ একবার শেষ চেষ্টা করে।' মনিবের উপদেশ মত দিন-সাতেক ধরে শশাঙ্ক শেষ চেষ্টা করে দেখল। পুলিসের বড় সাহেবের আফিসে ধর্না দিল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারল না। অ্যাডিশনাল সাহেবের চাপরাশীর চাপদাড়ি দেখেই ফিরে এল, সাহেবের শ্রীমুখ দর্শন হ'ল না। কিন্তু আসল হর্তা কর্তা এবং বিধাতা যিনি, অর্থাৎ এক নম্বর ডি. আই. ও. তিনি

ওকে বঞ্চিত করলেন না। খাতির করে কাছে বসিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তাড়াবো, আবার তার চাকরিও করবো—এ দুটো তো একসঙ্গে হয় না, শশাঙ্কবাবু। তার চেয়ে আপনার বোমাধারী বন্ধুদের স্মরণ করুন। তারাই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।'—বলে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

এমনি যখন অবস্থা, তখন এক উকিল-বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সব দেখে এবং শুনে তিনি পরামর্শ দিলেন, এক কাজ কর। কপাল ঠুকে চলে যাও পাগলা 'অ্যালুমিনিয়মে'র কাছে। অঘটন ঘটাতে যদি কেউ পারে, ঐ লোকটাই পারবে। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকলে, হয় লাঠি নয় রুটি, দুটোর একটা জুটবেই। সব কথা গুছিয়ে বলা শশাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হবে না মনে করে উকিল-বন্ধু তার হয়ে এই দরখাস্তটা লিখে দিয়েছেন।

সাহেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা মন দিয়ে শুনলেন এবং পুলিস সাহেবের সইকরা রিপোর্টটাও দেখলেন। তারপর শাণিত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন শশাঙ্কের দিকে। দু-চারটা ভাল পোশাক-পরা ইংরাজি কথা হয়তো মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল বেচারা। কিন্তু ঐ চোখের সামনে তারা আর বেরোতে সাহস পেল না। আমিও ভেবে পেলাম না, এ দৃষ্টির অর্থ কি। ছেলেটার হয়ে একটু ওকালতি করবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ ঐ পুলিস-রিপোর্টখানা পকেটস্থ করে একলাফে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক এবং ছুটে বেরিয়ে গেলেন গেটের দিকে। গেট খোলার দেরি সয় না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গাড়িখানা একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শশাঙ্কের এত সাধের দরখাস্ত পড়ে রইল টেবিলের উপর।

জানি, যার বিরুদ্ধে এত বড় এবং এই জাতীয় গুরুতর অভিযোগ, ইংরাজ সরকারের দয়া বা অনুগ্রহ তার প্রত্যাশা করা অনুচিত। তবু তার উকিল-বন্ধুটির মত আমার মনেও কেমন একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল, সাহেব হয়তো পুলিসের চশমা দিয়েই সবটা দেখবেন না।

ছেলেটিকে আমার আফিসে নিয়ে গিয়ে বসালাম। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মত কোনো কথাই খুঁজে পেলাম না। শুধু বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে একা নয়। হাজার হাজার শশাঙ্ক সেন ছেয়ে আছে এ দেশের ঘরে ঘরে। সে কোনো কথাই বলল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়ে বলল, 'ওরা যা লিখেছে,

তার একটা কথাও যদি সত্যি হত, স্যর, আমার কোনো ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু সবটাই যে মিথ্যা। অথচ—'

টেলিফোন বেজে উঠল জেল-গেটে। গেট-কীপার ছুটে এসে জানাল কালেক্টর সাব সেলাম দিয়া।

—ছেলেটি কি চলে গেছে? —ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন সাহেব।

—এখনো যায়নি, স্যর।

—ওকে আজকেই চলে যেতে বল। He must report to his Director at once.

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কোনো চিঠিপত্র দেবেন কিনা। তার আগেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখবার আওয়াজ শোনা গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা লালদীঘির বেঞ্চিতে দেখা হয়ে গেল পুরাতন বন্ধু দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে। ডি আই বি আফিসের হেড ক্লার্ক দুর্গাদাস দত্ত। বললেন, 'অ্যালুমিনিয়মের কাণ্ড শুনেছেন?'

—শুনিনি তো?

"কাণ্ডের" বর্ণনা দিলেন দুর্গাদাসবাবু।

অতিরিক্ত কাজের ভিড় সামলাতে না পেরে রবিবার সকালেও ওরা আফিস করছিলেন। এক নম্বর ডি. আই বি ইনসপেক্টর আলি সাহেবও উপস্থিত। ভাঙা গলায় কাকে ধমকাচ্ছিলেন। হঠাৎ সব চুপ। কি ব্যাপার! তাকিয়ে দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং কালেক্টর। আলি সাহেবের টেবিলে একটা কাগজ রেখে বললেন, 'এটা তোমরা পাঠিয়েছিলে?'

—ইয়েস, স্যর।

—Let me see his papers. শশাঙ্ক সেনের ফাইল বের কর।—বলে বসে পড়লেন সামনের একটা চেয়ারে।

সে-যুগে চাটগাঁয় বাস করে টিকটিকির কৃপাদৃষ্টির কবলে পড়েনি, বিশেষ সম্প্রদায় বাদ দিলে, এ রকম ছেলে কিংবা মেয়ে বোধহয় একটিও ছিল না। বয়স তার যাই হোক—পনের কিংবা পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু নিয়ম-মাফিক ফাইল থাকত শুধু রুই কাংলাদের বেলায়। তারই মধ্যে লেখা হত তাদের ঠিকুজি, কোষ্ঠী, রোজনামচা। চুণো-পুঁটিদের আবার ফাইল কোথায়? তাদের ইতি-বৃত্ত লুকিয়ে থাকত এ.'এস. আই. বা ওয়াচারদের পকেটবুকে। এমনি একটা কিছুর উপর ভিত্তি করেই হয় তো রচিত হয়েছিল শশাঙ্ক সেনের রিপোর্ট।

পাগলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সে-কথা বলা যায় না। অতএব শুরু হ'ল ফাইল-সন্ধান যাকে বলা যেতে পারে বন্যহংসীর অনুসরণ। প্রথমে এ টেবিল ও টেবিলে একটু-আধটু খোঁজাখুঁজি। তারপর আলমারির তাক। কিন্তু সাহেবের ওঠবার নাম নেই। তখন রেকর্ড রুমে ছাদ-সমান উঁচু র‍্যাকের উপর মই লাগিয়ে স্বয়ং ইনস্‌পেক্‌টর তার তিনজন সহকারী নিয়ে পুরানো কাগজের গাদা হাতড়ে চললেন। ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা করে আছেন। ধৈর্য পরীক্ষায় ওদের কাছে হার মানবেন না, এই যেন তাঁর পণ। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে। একটা বান্ডিল দু'তিনবার করে দেখেও সন্ধান-কার্য একসময়ে শেষ হ'ল। সর্বাঙ্গে ধুলোর প্লাস্টার লাগিয়ে শুষ্ক মুখে আলি সাহেব এসে দাঁড়ালেন ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলের পাশে। সাহেব একবার চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ইনস্‌পেক্‌টর। ধুলো ঘাঁটাই সার হ'ল। তবে আমি এটা আগেই জানতাম। যা নেই, বা কোনোদিন ছিল না, তা পাওয়া যায় না।'

পুলিস রিপোর্টটা চেয়ে নিয়ে সেইখানে বসেই একটা মোটা কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন তার উল্টো পিঠে—'শশাঙ্ক সেনের কাগজপত্র সব দেখলাম। তার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেল না। এখানে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সব ভিত্তিহীন। পুলিসের তরফ থেকে তার কনফার্মেশন সম্পর্কে কোনো বাধা নেই। স্টেশন ডিরেক্‌টর এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করেন জানালে বাধিত হবো।'

লেখা শেষ করে সেইখানে বসেই সেটা নিজে হাতে খামে ভরলেন, গালা আর মোমবাতি চেয়ে নিয়ে শীল মোহর করলেন তার উপর এবং স্টেশন-ডিরেক্‌টরের ঠিকানা লিখে বাইরে গিয়ে ফেলে দিলেন ডাকবাক্সে।

সাত আট দিন পরে আবার জেল ভিজিটের পালা। গেটে ঢুকেই বললেন, 'সেই ছেলেটি কনফার্মড হয়ে গেছে শুনেছ? ওদের ডিরেকটরের চিঠি পেলাম কাল।'

বললাম, 'আমিও ওর চিঠি পেয়েছি। ও আসছে দু-চার দিনের মধ্যে।'

—কেন?

—ঠিক জানি না। বোধহয় যে উপকারটা পেল, তার জন্যে নিজে এসে একবার—

—না, না। লিখে দাও খরচ-পত্তর করে আসতে হবে না মিছেমিছি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো...

সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। বললাম, 'ওর সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, আমি জানি। কিন্তু প্রথম লাইনটা বুঝতে পারিনি। শুনলাম, ওর ফাইল টাইল কিছু পাওয়া যায়নি। অথচ—'

—লিখেছি সব পাওয়া গেছে, এই তো? তার কারণ বুঝলে না? যদি লিখতাম কাগজ পাওয়া গেল না, বাড়ি পেঁছিবার আগেই ঐ ইনস্‌পেক্‌টর লাফাতে লাফাতে ছুটত আমার পেছনে, দাঁত বার করে বলত, ফাইল পেয়েছি, স্যর। এক শীট কাগজে গোটা কয়েক আঁচড় কাটতে কত সময় লাগে! দশ মিনিট? তারও কম। সে সুযোগ ওদের আমি দিতে চাইনি। একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'ল। তাছাড়া উপায় ছিল না। এর পরে আবার কিছু একটা বানিয়ে ফেলবে, সে পথ বন্ধ করে দিলাম।'—বলে, ছেলেমানুষের মত হো হো করে হেসে উঠলেন।

॥ ছয় ॥

হাঙ্গার স্ট্রাইক? হ্যাঁ; তা দেখেছি বৈ কি। দুটো চারটে নয়, দশ বিশটাও নয়, দুশো, চারশো। ইংরেজ-রাজত্বে দেখেছি সত্যাগ্রহী কংগ্রেস, কংগ্রেস-রাজত্বে দেখলাম হত্যাগ্রহী কমরেডস। জাত একই, তফাৎ শুধু বর্ণে। ও'রা ছিলেন সাদা, এ'রা লাল। উভয় ক্ষেত্রেই অনশন একটা পলিটিক্যাল মহাস্ত্র। লক্ষ্যস্থল সরকার নামক নিরাকার পদার্থ, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। জেলটা শুধু উপলক্ষ। তবু যেহেতু সে দৃশ্যমান, তাকে ধরা যায় এবং সে ধরে রাখে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ যখন বাধে, তার সঙ্গেই বাধে। তাকে ঘিরেই চলতে থাকে আঘাত আর প্রতিঘাতের পালা।

হাঙ্গার স্ট্রাইক প্রথমেই যাকে স্ট্রাইক করে সেটা হ'ল জেলের আইন। 'খাবো না' বলে মুখ ভার করলে মায়ের কিংবা প্রিয়ার কাছে সেটা হয় তো অভিমান, কিন্তু জেলের কাছে, অপরাধ। জেলকোডের পরিভাষায় তার নাম major offence. অপরাধ মাত্রেরই দন্ড আছে। আগেকার আমলে যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সেকথা জানতেন এবং নিজেরা দন্ডপানি না হয়েই দন্ড গ্রহণ করতেন। তাঁরা বলতেন, বিরোধটা পেয়াদার সঙ্গে নয়, পেয়াদার পেছনে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যে তাকে চালাচ্ছে, তার সঙ্গে। জেল আর তাদের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া ছিল, অনেকটা, যাকে বলে, mutual understanding. আমি জোর করে মুখ বন্ধ করে থাকবো, তুমি আমাকে জোর করে খাওয়াবে। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। ঠোকাঠুকি আছে, মন কষাকষি নেই।

হাল আমলে অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশী হাঙ্গার স্ট্রাইকের নীতি দেখলাম অন্য রকম। পেয়াদাটাকে যখন হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, তখন ওর ওপরেই

নাও এক হাত। ও যেমন তোমার প্রোলিটারিয়েট নাকের মধ্যে রবারের নল চালিয়ে দুধ ঢালছে, তুমি ওর বুর্জোয়া কানের মধ্যে বস্তি-নিঃসৃত বাক্য-সুধা বর্ষণ কর। সুযোগ পেলে তোমার হাতুড়ি ও কাস্তে মার্কা বদ্ধমুষ্টি চালিয়ে ওর ঐ পুঁজিবাদী নাকটাকে উড়িয়ে দিতে পার। ঢিল খেয়ে ও যদি পাটকেলটা ছোঁড়ে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। প্রপাগান্ডার ডান্ডা চালিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করবার উত্তম সুযোগ। ঊনপঞ্চাশ সালের কমরেডি হাঙ্গার স্ট্রাইকের প্রধান তত্ত্ব ছিল এই প্রচার।

মোটামুটি ভাবে হাঙ্গার স্ট্রাইক মাত্রেই একটা শব্দহীন লাউড-স্পীকার। জনগণের কানের পর্দাকে প্রবল বেগে আঘাত করবার মত এত সহজ আর এমন অব্যর্থ অস্ত্র আর কিছুই নেই। আপনার বক্তৃতা যখন শ্রোতা পায় না, বিবৃতি পায় না পাঠক, কিংবা শ্লোগান-মুখর শোভাযাত্রা যখন দর্শক-অভাবে শোভা-হীন, তখন আপনার নেতৃত্ব রক্ষার একমাত্র পথ,—জেলে গিয়ে হাঙ্গাব স্ট্রাইক। দ্রুত বিস্মরণশীল জনতা অন্তত কিছুদিন আপনাকে স্মরণে রাখবে।

কিন্তু অনশন যেখানে নিছক রাজনৈতিক, তার মধ্যে উত্তেজনা যতই থাক, রস নেই। বিশেষ করে জেলবাবুদের কাছে ওগুলো একেবারে বিস্বাদ এবং বিবর্ণ। তার উদ্দেশ্য থেকে বিধেয়, সবটুকু আমাদের কণ্ঠস্থ। ও পক্ষের ধরণ--ধারণ এবং এ-পক্ষের বচন করণ, সব বিধিবদ্ধ, গতানুগতিক। যে-কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ওটা একটা আনুষঙ্গিক উৎপাত মাত্র।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের মধ্যেও চমক আছে, আছে বৈচিত্র্যের রং, এবং সেটা দেখা দেয় তখনই, যখন ও অস্ত্রটা পড়ে গিয়ে তাদের হাতে, যাদের আমরা বলি সাধারণ কয়েদী। বলা বাহুল্য এটা তাদের নিজস্ব হাতিয়ার নয়। তাদের অস্ত্রশালায় এর স্থান ছিল না কোনোদিন। তারা জানত, লড়াই-এর একমাত্র পথ—শত্রুর উপর লাফিয়ে পড়, উদ্যত হাতিয়ার দিয়ে আঘাত কর তার দেহে। কিন্তু শুধু শুয়ে থেকে আর পড়ে থেকেও যে লড়াই চলে—এমন লড়াই, যার কাছে প্রতিপক্ষের সমস্ত অস্ত্র অকেজো হয়ে যায়, সেটা তারা প্রথম দেখল "স্বদেশী বাবু"দের শিবিরে। সেখান থেকেই তাদের দীক্ষা। তারপর স্থানে-অস্থানে এই অপূর্ব অস্ত্র তারা প্রয়োগ করেছে, এবং এখনো করছে, কখনো ব্যক্তিগত, কখনো দলগত প্রয়োজনে। তার কাহিনী বিচিত্র।

সাতচল্লিশ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা যখন এল, কোনো একটা সেন্ট্রাল জেলের দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদিরা বলে বসল, আমরা মুক্তি চাই।

যুক্তিটা কি? জানতে চাইলেন কর্তৃপক্ষ। উত্তর অত্যন্ত সরল—অপরাধ যা করেছিলাম সে সেই ব্রিটিশ-রাজত্বে। এতদিন তো তার ফল-ভোগ করলাম। আর কেন? পরাধীন যুগের দণ্ড যদি স্বাধীন যুগেও কায়েম রাখবে, তবে এ স্বাধীনতার মূল্য কি? বলে, তারা হুঙ্কার ছাড়ল—এ আজাদি ঝুটা হ্যয়। সরকার নামক যে একটি নৈর্ব্যক্তিক গোষ্ঠী আছে, সকল দেশে এবং সকল যুগেই তার রসবোধ বড় কম। 'রিলিজ'-এর বদলে তাঁরা মঞ্জুর করলেন কিঞ্চিৎ 'রেমিশন'। অর্থাৎ, দণ্ডের শেষ না করে, করলেন হ্রাস। পরদিন থেকেই ব্যারাকে ব্যারাকে সুরু হ'ল হাঙ্গার স্ট্রাইক পর্ব। সারি সারি শুয়ে পড়ল দশ, বারো, বিশ এবং পঁচিশ বছরের দল, যাদের বুকের উপর ঝুলছে খুন রাহাজানি, দাঙ্গা আর নারী-ধর্ষণের চাকতি। স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা বিস্ময়ের চেয়ে বিরক্তি বোধ করলেন বেশি, তার সঙ্গে বোধহয় কিঞ্চৎ কৌতুক, এই ভেবে যে একদা যাঁদের হাতে এরা দীক্ষা নিয়েছিল, আজ তাঁদেরই এরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে উদ্যত।

একদিন গেল, দুদিন গেল। তিনদিনের দিন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল একদল ডাক্তার আর সেই সঙ্গে বড় বড় রবারের নল আর বালতি বালতি দুধ, বার্লি, ডিম, কমলালেবু, গ্লুকোজ আর কি সব ওষুধপত্তর। ফানেল ভর্তি সেই সব রসায়ন নল যোগে চলে গেল নাসিকা-টানেলের মধ্যে। রসনা-তৃপ্তি না হোক, উদর-পূর্তির তরল ব্যবস্থা। 'স্বদেশী' হাঙ্গার স্ট্রাইকের চিকিৎসা-পদ্ধতিও ছিল ঠিক একই রকম। তফাৎ এই যে, তাঁরা ঐ নলটাকে যথারীতি অস্বীকার করে মাথা-নাড়া দিতেন, আর সরকার-পক্ষ থেকে মাথাটা যথারীতি চেপে ধরা হ'ত। কিন্তু তাঁদের এই মন্ত্র-শিষ্যেরা এই অনাবশ্যক আবরণটা অতিক্রম করে গেল। মাথা নাড়া আর মাথা ধরার প্রয়োজন রইল না। বরং আরও দু-চার দিন যেতেই দেখা গেল, ঐ বালতি আর রবারের নলটির উপর অনশনকারীর আকর্ষণ ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠছে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা দেখা না দিলে সারি সারি চোখগুলো তৃষিত প্রতীক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কর্তৃস্থানীয় জনৈক জবরদস্ত উপরওয়ালা একদিন এই দৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ডাক্তার না এনে তোমাদের আনা উচিত ছিল গোটাকয়েক হান্টার। তাহলে এ দুর্ভোগ আর একদিনও ভুগতে হত না।' তাঁর পরামর্শ অবশ্য গৃহীত হয়নি। তবু দুর্ভোগ বেশীদিন ভুগতে হ'ল না। আপনা হতেই

একদিন দেখা গেল, খাদ্যের রূপান্তর ঘটেছে—তরল থেকে কঠিন স্তরে এবং প্রবেশপথ নাসিকা নয়, মুখবিবর।

"দায়মলি"দের* এই দলবদ্ধ অনশনের উদ্দেশ্য যাই হোক, ধরণটা ছিল রাজনৈতিক। অনেকটা সেই স্বদেশী বাবুদের পুরানো রাস্তা। কিন্তু করণ সিং-এর হাংগার স্ট্রাইক একেবারে তার নিজস্ব। উদ্দেশ্যই যে শুধু অভিনব তাই নয়, ধরণটাও নতুন। কতগুলো দুঃসাহসিক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত একটা গ্যাঙ কেস্-এ আরো কয়েকজনের সঙ্গে করণ সিং-এর জেল হ'ল দশ বছর। দলবল থেকে আলাদা করে তাঁকে পাঠানো হ'ল এক সেন্ট্রাল জেলে। গৌরবর্ণ দেহ, বাঁশীর মত নাক, রুক্ষ আয়ত চোখ। খাবারের থালার দিকে তাকিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'লে যাও। নেহি খায় গা।'

—কেন, খাবে না কেন? জানতে চাইল রন্ধনশালার মেট।

—ইয়ে গোশত্ হালাল হ্যয়।

—তবে কি গোশত্ খাবে তুমি?

উত্তরে সে যা জানাল, তার মানে—জবাই-করা জানোয়ারের মাংস যা বাজারে পাওয়া যায়, তার কাছে শুধু অখাদ্য নয়, অস্পৃশ্য। কোনো দেবস্থানে বলি-দত্ত যে পশু তারই মাংস চাই, আর তার সঙ্গে চাপাটি। এই তার দৈনন্দিন খাদ্য। বাজে জিনিস তার রুচবে না।

কর্তৃপক্ষ জানালেন, সেটা সম্ভব নয়। বেশ, তাহলে খাদ্য গ্রহণও সম্ভব নয় করণ সিং-এর পক্ষে।

চলল হাংগার স্ট্রাইক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এবেলা ওবেলা নেজাল ফিডিং। বুঝিয়ে সুঝিয়ে হার মানল জেলের লোক। সুপার এসে যথা-রীতি ওয়ার্নিং দিলেন। তারপর একটি একটি করে প্রত্যাহার করা হ'ল তার কারাজীবনের যা কিছু সুবিধা সুযোগ। কেটে নেওয়া হ'ল তার যা কিছু ছিল অর্জিত রেমিশন, বন্ধ হ'ল ভবিষ্যৎ অর্জনের অধিকার। তারপর এল চরম পন্থা। অর্থাৎ আইন ভংগের মামলা দায়ের হ'ল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। হাকিম এলেন। কোর্ট বসল সুপারের ঘরে। আসামীর ওঠবার শক্তি নেই। স্ট্রেচারে করে আনা হ'ল হাকিমের কাছে। তুমি দোষী না নির্দোষ—প্রশ্ন

---

* খুন এবং খুন-সহ ডাকাতির অপরাধে যাদের বিশ এবং পঁচিশ বছর জেল হয়, সিপাই-মহলের চলতি ভাষায় তাদের বলে দায়মলি।

করলেন কোর্ট। আসামী নিরুত্তর। অনেক করে আবার বোঝালেন হাকিম। জেলকোডের নির্ধারিত খাদ্য-বর্জন করা গুরুতর অপরাধ। তার জন্যে দণ্ড বেড়ে যাবে। করণ সিং মুদ্রিত-চক্ষু, নির্বিকার। ছ' মাস জেল দিয়ে চলে গেলেন হাকিম। এমনি করে কেটে গেল কয়েক মাস। কেটে গেল বছর। খবর পেয়ে পাঞ্জাবের কোন্ দূর গ্রাম থেকে এল তার বাপ। ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নদেহ। বয়স পার হয়ে গেছে সত্তরের কোঠা। জেল-ডাক্তার তার কম্পিত-শীর্ণ হাতে তুলে দিলেন একটা কমলালেবু। ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে বলল বৃদ্ধ, 'খেয়ে নে। আমি আর কদিন? আর তোকে বলতে আসবো না।' করণ সিং-এর চোখ খুলে গেল। রক্তাভ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বিরক্ত করো না। বাড়ি ফিরে যাও।'

—তুই আমার জোয়ান ছেলে না খেয়ে জান দিবি জেলখানায়; আমি বাড়ি ফিরবো কোন্ মুখে? তোর মা থাকলে কি এমন করে ফেরাতে পারতিস তাকে?

ছেলের বুকের উপর ভেঙে পড়ল বিপত্নীক বৃদ্ধ। চারদিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, জেলরক্ষী আর জেলবন্দী, সবারই চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু করণ সিং-এর নিমিলিত চোখের কোণে একবিন্দু জলরেখা দেখা দিল না।

ক্ষিতীশ রুদ্র জেলে এসেছিল কোন এক দাঙ্গা কেস-এর আসামী হয়ে। তারপর চার বছর জেল হয়ে গেল। বছর খানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল, একটু চা না হলে জীবন দুর্বহ। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্যতালিকায় চা অনুপস্থিত। সেকথা তাকে জানানো হ'ল। উত্তরে বলল ক্ষিতীশ, 'তা জানি। কিন্তু আমি চা চাইছি on medical ground.' অর্থাৎ, ওজন কমে গেলে কিংবা শরীর খারাপ হ'লে যেমন দুধ, মাখন কিংবা অতিরিক্ত মাছ মাংসের বরাদ্দ করেন মেডিক্যাল অফিসার, তেমনি ক্ষিতীশ রুদ্রের দাবি হ'ল সামান্য এককাপ চা। 'কিন্তু চায়ের অভাবে শরীর তো তোমার খারাপ হয়নি?'—প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

ক্ষিতীশ নিঃশব্দে চলে গেল।

মাসখানেক পরে আবার এল টিকিট নিয়ে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে কণ্ঠার হাড়। ওজন কমে গেছে আট পাউন্ড। মুখে জয়ো-

গ্লাসের মৃদু হাসি। ডাক্তারও হাসলেন, টিকেটখানা চেয়ে নিয়ে কি খানিকটা লিখলেন তার পিঠে। পরদিন সকালে চা-এর বদলে এল এক চার্জ। স্বাস্থ্যের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলার অপরাধে সুপারের সামনে হাজির হ'ল ক্ষিতীশ রুদ্র। ব্যাপার শুনে সুপার একটা ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ক্ষিতীশ তার দাবি ছাড়ল না। সেদিন বিকালেই রিপোর্ট দিল বড় জমাদার, 'ক্ষিতীশ খানা ছোড় দিয়া।'

কয়েদী-মহলে কিঞ্চিৎ কৌতুকের উদ্রেক হ'ল। করণ সিং-এর আচরণে সমর্থন না থাক সম্ভ্রম বোধের অভাব ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশ রুদ্রের ব্যাপার নিয়ে চলল লঘু আলোচনা। লোকে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়, প্রিয়ার জন্যে জান দেয়; সেটা নতুন নয়, আশ্চর্যও নয়। কিন্তু তুচ্ছ এক পেয়ালা চা-এর জন্যে পৈতৃক প্রাণটা বিলিয়ে দিচ্ছে, এত বড় শহিদ্ এই প্রথম দেখা গেল। ক্ষিতীশের ভ্রূক্ষেপ নেই। মাসকয়েক কেটে গেল ডিম দুধ আর কমলার রস নাসাধঃকরণ করে। ইতিমধ্যে তার মায়ের কাছ থেকে এল এক চিঠি। এই অহেতুক আত্মহত্যার পথ থেকে নিরস্ত হবার জন্যে নানারকম উপদেশ দিয়ে শেষের দিকে লিখেছেন, 'মনে রেখো তুমি যেখানে আছ, সেখানে লোকে আরাম করতে যায় না, যায় কৃত অপরাধের শাস্তি-ভোগ করতে। সেকথা ভুলে গিয়ে যারা জেলে গিয়েও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আব্দার করে, তারা জানে না যে সেটা বাহাদুরি নয়, নির্লজ্জ কাঙালপনা। তোমার আচরণে তুমি লজ্জিত হবে, তোমার মা হয়ে এইটুকু শুধু তোমার কাছে আশা করি।'

এ চিঠি পাবার পরেও ক্ষিতীশের অনশন অব্যাহত রইল, কিন্তু অবস্থার ঘটল দ্রুত অবনতি। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হলেন। মায়ের কাছে জরুরী তার গেল,—তাঁর ছেলের অবস্থা গুরুতর। ইচ্ছা করলে তিনি এসে দেখে যেতে পারেন। তিনি এলেন না। লিখে পাঠালেন, 'আমি গিয়ে আর কি করবো! যে-ছেলের কাছে, মা'এর চেয়ে চা'এর দাবি বড় তাকে আমার বলবার কিছু নেই।' চিঠিখানা পড়িয়ে শোনানো হ'ল ক্ষিতীশকে। সেদিন বিকালেই আবার খবর নিয়ে এল বড় জমাদার 'ক্ষিতীশ অনশন্ তোড়্ দিয়া।'

না; আমরণ অনশনের চরম পরিণাম দেখবার দুর্ভাগ্য আমার ঘটেনি। দেখেছি তাদের বৈচিত্র্যময় পরিণতি। কোনোটা হয়তো পুরোপুরি ব্যর্থ

হয়েছে, কোনোটা আংশিক। কোনোটা আপাত-জয়লাভের গৌরব না পেলেও আসন্ন জয়ের পথ খুলে দিয়ে গেছে। কোনোটা আবার শেষ হয়েছে গিয়ে কোনো অপ্রীতিকর সীমানায়, রেখে গেছে শুধু তিক্ত স্মৃতি। যবনিকা যেখানেই পড়ুক, এবং যে-ভাবেই পড়ুক, সব চেয়ে খুশী হয়েছি আমরা, অর্থাৎ জেলের লোক। নাকের বদলে মুখের বিবরে এক পেয়ালা ডাবের জল বা কমলার রস ঢেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আফিসে ফিরে গেছি। মুক্তি পেয়েছি দৈনন্দিন রিপোর্ট পাঠাবার দুরূহ কর্তব্য থেকে। সতত-দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ডাক্তারবাবুরা।

দীর্ঘ অনশন শেষে কেউ দীর্ঘদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে, কেউ বা চিরকালের তরে সার করেছে পাকযন্ত্রের বৈকল্য, কারো আবার সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছে দুরারোগ্য বাতব্যাধি। অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাতে গিয়ে কিংবা অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে মানুষকে বাঁচাবার যে প্রাথমিক দায়িত্ব, তাই পালন করতে গিয়ে অভিনন্দন যা লাভ করেছি, তাও কৌতুকময়। কেউ দিয়েছেন নীরব ঔদাসীন্য, কারো কাছে লাভ করেছি অকথ্য কটূক্তি এবং ইচ্ছাকৃত অপমান, কারো হাত থেকে পেয়েছি আকস্মিক আক্রমণ। মনে পড়ে, একবার কোনো এক রাজনৈতিক দলের কয়েকজন পাণ্ডা কী একটা দাবি জানিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করলেন। বন্ধুরা পালা করে উদয়াস্ত তাদের ঘিরে বসে আছেন। ডাক্তার কাছে গেলে তেড়ে আসেন। অন্য কোনো জেল-অফিসার দেখামাত্র একেবারে মারমুখী। এদিক ওঁদের নাসিকা-ভোজনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বন্ধুরা বাধা না দিয়ে ছাড়বেন না। সুতরাং আমাদের একমাত্র পন্থা হ'ল শুভাকাঙ্ক্ষীদের কবল থেকে ওঁদের নিঃশব্দে হরণ করে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। আর কালবিলম্ব না করে দলবল নিয়ে হানা দেওয়া গেল। কয়েকজন কুস্তিগির সিপাইকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল,—যারা আক্রমণ করবেন, তাদের প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন নেই, শুধু বাহুবিস্তার করে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেই চলবে। ওয়ার্ডের কাছাকাছি যেতেই শুরু হ'ল তর্জন গর্জন। সে সব অগ্রাহ্য করে স্ট্রেচারগুলো চলে গেল ভেতরে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একতলার দরজার ঠিক বাইরেটায়। হঠাৎ পাশের অন্য কোন্ একটা ব্যারাকের দোতলা থেকে চিৎকার করে উঠল একজন সাধারণ কয়েদী, "সরে যান, স্যার।" হুঁশিয়ারিটা কার উদ্দেশ্যে, না জেনেই খানিকটা পিছিয়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ইঞ্চি তিনেক দূরে সশব্দে ভেঙে পড়ল

একটা মাটিভর্তি মস্ত বড় পাতাবাহারের টব। ওটা যে উপরের বারান্দা থেকে আমারই শিরোদেশ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেটুকু বুঝতে দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে সবে যেতে আর এক সেকেন্ড দেরি হলে আপনাদের আজ এমন করে জরাসন্ধের কবলে পড়তে হত না।

হাঙ্গার স্ট্রাইক কেন হয়, কোথায় তার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি—সে-সব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করবার মত সন্ধানী আলো আমার চোখে নেই। দীর্ঘকাল ধরে সাদা চোখে যা দেখলাম, তাতে এই কথাই মনে হয়েছে—সব হাঙ্গার স্ট্রাইকের অন্তরালে একটা সাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতি লুকিয়ে আছে। তার নাম অভিমান। বিচিত্র তার রূপ, বিভিন্ন তার লক্ষ্য। সে অভিমান কখনো রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থার উপর, কখনো নিজের উপর, কখনো কোনো আত্মজনের উপর, আবার কখনো বা অস্পষ্ট অনির্দেশ্য কোনো আদর্শের উপর। বাড়িতে মা অথবা স্ত্রীর উপর রাগ করে না খেয়ে থাকা আর জেলে সরকার বা তার কোনো প্রতিনিধির উপর রাগ করে না খেয়ে থাকা—তলিয়ে দেখলে এ দুটো একই বস্তু। জাত একই, তফাৎ শুধু রূপের। এ দু'এর পেছনে যে ভাবাবেগ তার "কাইন্ড" এক, তফাৎ শুধু "ডিগ্রির"।

সব মানুষের মনের মধ্যেই অভিমান আছে। কিন্তু কারাজীবনের আলো বাতাসে ছড়িয়ে আছে তার পুষ্টির উপাদান। একজন আধুনিক কারাতত্ত্ববিদ বলেছেন, পৃথিবীতে ক্রিমিনালই হচ্ছে সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাত। 'ক্রাইম'এর পেছনে বুদ্ধির প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রাইম করবার পর জেলে যখন সে আসে, তার বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ে। যত দিন যায়, তার মাথার দিকটায় ভাটা পড়তে থাকে, জোয়ার দেখা দেয় বুকের দিকে। দৈনন্দিন জীবনে যে শক্তি তাকে চালিত করে, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি যতখানি, তার চেয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে হৃদয়বৃত্তি। যুক্তির চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে ভাবালুতা। বৃহৎ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, ঐ পাষাণ বেষ্টনী ঘেরা ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে বসে বসে তার কেবলই মনে হতে থাকে এ দুনিয়ায় তার কেউ নেই, সংসারে সবার কাছে, সব কিছু থেকে সে বঞ্চিত, সকলের দ্বারা সে বর্জিত। তাই সবার বিরুদ্ধে তার দুরন্ত ক্ষোভ, সকলের উপরে তার দুর্জয় অভিমান। কয়েদী জাতটা বুদ্ধিমান, একথা হয়তো সত্য। কিন্তু তার চেয়ে স্পষ্টতর সত্য।—তারা অত্যন্ত অভিমানী এবং অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর।

হাঙ্গার স্ট্রাইক অনেক ঘটেছে আমার জীবনে। পিছনের দিকে তাকিয়ে সেইসব অভিমান-ক্ষুব্ধ শীর্ণ মুখগুলো আজ দেখতে পাচ্ছি। সারি সারি শুয়ে আছে হাসপাতালের লোহার খাটে। কেউ বা একান্ত নিঃসঙ্গ—পড়ে আছে কোনো নির্জন সেল'এর সংকীর্ণ অন্ধকারে। কোনোটা ঝাপসা হয়ে গেছে, কোনোটা বা আজও স্পষ্ট। তারই মধ্যে একখানা বিবর্ণ মুখ যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে চোখের উপর। মনে পড়ছে প্রথম যেদিন সে এল। কালো ঘেরাটোপ-ঢাকা কয়েদী—গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়াল আউটার আর ইনার গেটের মাঝখানে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, প্রশস্ত বুক, ঈষৎ সোনালী রং-এর কোঁকড়ানো চুল নেমে এসেছে কাঁধের উপর। তার উপরে বিশাল পাগড়ি। আধময়লা জোব্বার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল দেহশ্রী। নামটাও জমকালো। সৈয়দ আফজল খাঁ। পাঠান না আফগান ঠিক জানি না। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কোন্‌ প্রান্তে তার দেশ। ওয়ারেন্ট খুলে দেখলাম, ৩৯৬ আই, পি, সি। ডাকাতির সঙ্গে নরহত্যা। শুনলাম, তিনচারটা মারাত্মক মামলার সঙ্গে সে জড়িত। তাই কোর্টে যাওয়া আসার পথে প্রিজন্‌-ভ্যানের মধ্যেও তার হাতে পড়ত হাতকড়া। একদিন এই নিয়ে লেগে গেল পুলিসের সঙ্গে। হাবিলদার বলল, 'হাতকড়া খুলে দিলে কোন্‌ দিন তুমি লাফিয়ে পড়ে ছুট্‌ দাও, কে জানে?' '—যদি দিই, আটকাতে পারবে?' বলে এক দুই তিন ঝট্‌কায় ভেঙে ফেলল হাতকড়া। লাফিয়েও পড়ল না, ছুটও দিল না। শুধু দেখিয়ে দিল, সে সবই পারে। তারপর থেকে কোর্টের পথে তার ডাইনে বাঁয়ে লেগে থাকত দুজন করে রাইফেলধারী গুর্খা।

যেমন বিশাল বপু, তেমনি বিপুল ছিল তার দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার। কিন্তু আফজল খাঁর দীর্ঘ হাজতবাসের মধ্যে ওদিকটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। শহরের প্রান্তে ওদের মস্ত বড় ঘাঁটি। সেখান থেকে ওর বন্ধুরা নিয়মিত যোগান দিত ডেক্‌চি-ভর্তি খাসী বা ভেড়ার মাংস, মোটা মোটা ঘৃতজর্জর চাপাটি আর সেই সঙ্গে আঙুর-আনার-কাজু-মনাক্কার প্যাকেট। বিচারাধীন আসামীর বাইরে থেকে খাদ্য-প্রাপ্তি আইনসিদ্ধ। জেল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অধিকার চলে যায়। তখন সে পুরোপুরি জেলের পোষ্য। সুতরাং, সাত বছর মেয়াদ নিয়ে যেদিন কোর্ট থেকে ফিরে এল আফজল খাঁ, উভয় দিকেই সমস্যা দেখা দিল। তৃতীয়শ্রেণীর কয়েদী-খাদ্য তিন প্রকার—বেঙ্গল ডায়েট (দুবেলা ভাত) বিহার ডায়েট (একবেলা

ভাত, একবেলা রুটি) আর পাঞ্জাব ডায়েট (দুবেলাই রুটি)। প্রথামত ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ ডায়েট নেবে তুমি ?'

আফজল খাঁ গম্ভীরভাবে বলল, 'আফগান ডায়েট।'

ডাক্তারের কোডে এ হেন বস্তুর উল্লেখ নেই। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল—পাঞ্জাব ডায়েট্। ডাক্তারের বোধহয় মনে হয়েছিল, এই পেশোয়ারী পাহাড়টিকে আর যেখানেই হোক্ অন্নভোজী এলাকায় ফেলা যায় না। আফজল নালিশ জানাতে এল আমার কাছে। সোজাসুজি মন্তব্য করল, 'আপ্‌কা জেহ্‌লমে ইন্‌সাব্ নেহি হ্যায়।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কেন, কি অবিচারটা দেখলে তুমি ?'

—আপ্‌কা বেঙ্গল ডায়েট্ হ্যায়, বিহার ডায়েট হ্যায়, পাঞ্জাব ডায়েট্‌ভি হ্যায়, আফগান ডায়েট্ কে'ও নেই হোগা ?

সংগত প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আফগান ডায়েট্ কি পদার্থ, খাঁ সাহেব ?'

—লিখ্ লিজিয়ে, বলে একটা দৈনিক খাদ্য তালিকার ফিরিস্তি দিয়ে গেল আফজল খাঁ। "সেরভর দুম্বাকা গোশ্‌ত্" বিকল্পে খাসীর মাংস থেকে শুরু করে আটা মাখন দুধ মশলা পেস্তা বাদাম ফলমূল এবং সকলের শেষে এক প্যাকেট সিগারেট যোগ করে যখন থামল, হিসাব কষে দেখলাম, তার দাম কম করে ধরলেও ছ'টাকা বারো আনা। একজন সাধারণ কয়েদীর রোজকার বরাদ্দ শুধু বারো আনা কিংবা তার চেয়েও কম। সুতরাং আফজল খাঁর দাবি পূরণ যে আমাদের শক্তির বাইরে একথা স্পষ্ট করেই জানাতে হল। সেও ঠিক তেমনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে গেল যে এ ছাড়া এবং এর চেয়ে কম কোনো খাদ্য সে গ্রহণ করবে না।

শুরু হ'ল হাঙ্গার স্ট্রাইক।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। আমার হাসপাতাল পরিক্রমার পালা। অন্য সব ওয়ার্ড থেকে দূরে এক কোণের দিকে আফজল খাঁর ছোট ঘরটিতে গিয়ে দেখলাম, তার নাসিকা-ভোজনের আয়োজন চলছে। একটা বেশ বড় বালতি ভরা দুধ। ডিম, কমলালেবু ইত্যাদির পরিমাণও রীতিমত রাজসিক। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাঙ্গার স্ট্রাইকের রুগী আপনার ক'জন ?'

—আজ্ঞে, একজন, বলে ডাক্তার একটু হাসলেন। কৌতূহল হল। দাঁড়িয়ে গেলাম খানিকক্ষণ। 'ফিড্' শুরু হ'ল। একটা বড় জগে করে ফানেলের মধ্যে মিশ্র রসায়ন ঢালা হচ্ছে, আর দুটো নল বেয়ে সেটা ধীরে ধীরে চলে

যাচ্ছে উন্নত নাসারন্ধ্রে। এক একটা জগ শেষ হয়, আর চেঁচিয়ে ওঠে আফজল, 'আউর দেও।' জগ ভরতে যেটুকু দেরি, তার মধ্যে আবার হুঙ্কার দেয়, 'আউর দেও।' এমনি করে গোটা বালতিটা নিঃশেষ হয়ে গেল।

আফজল খাঁর অনশন যে একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার অফিসারদের মতে, যে লোক সারা-জীবন ধরে শুধু মণ মণ মাংস চিবিয়ে এসেছে, সে নাক দিয়ে দুধ গিলে কতদিন থাকবে। পেটের ক্ষিধে না হয় মিটল, দাঁতের ক্ষিধে মেটাবে কি দিয়ে? কিন্তু দেখলাম, আমরা ভুল করেছি। মাস কেটে গেল। আস্তে আস্তে শয্যার সঙ্গে মিশে গেল সেই বিশাল দেহ; কিন্তু মন রইল অটল। পুরোপুরি আফগান ডায়েট না হলেও, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে, তার কাছাকাছি কোনো খাদ্য-তালিকা মঞ্জুর করা অসম্ভব হবে না, এ রকম একটা আভাস তাকে দেওয়া হয়েছিল। কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

একদিন কী একটা প্রয়োজনে বিকালে একবার যেতে হয়েছিল জেলখানায়। হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আফজল খাঁকে দেখে যাবার ইচ্ছা হল। একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে তার ছোট ঘরটিতে। সেই মৃদু আলোয় তার রক্তহীন মাংসবিরল দীর্ঘ দেহটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, সে বেঁচে নেই, পড়ে আছে শুধু একটা চর্মাবৃত কঙ্কাল। ধীরে ধীরে খাটের পাশে যে চেয়ারখানা ছিল তার উপরে গিয়ে বসলাম। একবার শুধু সে তার নিষ্প্রভ চোখদুটি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পড়ে রইল তেমনি নিস্পন্দ নিথর মৃতদেহের মত। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, 'খাঁ সায়েব!'

—সাব্!

—এমনি করে জান দিয়ে কী লাভ?

—এ জান রেখেই বা লাভ কি, ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল আফজল।

চমকে উঠলাম। তবে কি এই আত্মহত্যার পিছনে আর কোনো নিগূঢ় কারণ আছে? আফগান ডায়েটটা শুধু অভিনয়? বললাম, 'এ কথা কেন বলছ? সাতটা বছর কতটুকু সময়? দেখতে দেখতে চলে যাবে। জোয়ান বয়স তোমার। নতুন করে ঘর বাঁধবে। গোটা জীবনটাই তো সামনে পড়ে আছে।'

ক্ষীণ আলোকে মনে হল তার বিবর্ণ ওষ্ঠের কোণে যেন জেগে উঠল একটু-

খানি মৃদু হাসির আভাস। তেমনি ধীরে ধীরে বলল, 'ঘর আমার ভেঙে গেছে, বাবুসাব।'

—তোমার বাপ মা আছে?

—যখন দেশ ছেড়েছি, তখন ছিল। তারপর কি হয়েছে, জানি না।

—জেনানা?

—না সাহেব। সাদি হয়নি আমার।

—যাকে চেয়েছিলে, তাকে পাওনি বুঝি?

আফজল খাঁ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। শোনা গেল মৃদু দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। তারপর উদাস কণ্ঠে বলল, 'সে সব ব্যাপার চুকে বুকে শেষ হয়ে গেছে। আজ নতুন করে সে কথা তুলে কোনো লাভ নেই।'

বললাম, 'সংসারে কিছুই কোনোদিন চুকে যায় না' আফজল খাঁ। ভাঙা-গড়াই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। যাক্, রাত হ'ল; এবার আমি উঠি।'

আফজল খাঁ শীর্ণ হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করল। আর কোনো কথা বলল না।

দিন তিনেক পরে সন্ধ্যাবেলা আমার বাংলো-সংলগ্ন বাগানে একটা বাঁধানো চত্বরের উপর বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষণ-সিক্ত গাছপালার উপর সন্ধ্যার করুণ ম্লানিমা। সেদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, চারদিকে যা কিছু দেখছি, সব যেন কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনার অদৃশ্য সূত্র দিয়ে গাঁথা। আলো নেই, আশা নেই; সংসারের আসল রূপ এমনি অশ্রুসজল।

টেলিফোন বেজে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার। আফজল খাঁ আমার দর্শন-প্রার্থী। 'আজই?' 'হ্যাঁ, এখনই।'

সেই ছোট্ট ঘরখানায় স্তিমিত আলোয় বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনে গেলাম আফজল খাঁর ক্ষীণ কণ্ঠের গুঞ্জরণ। বিশেষ কোনো ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়নি তার কথা। আমার অনুচরদের যখন ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম, সে বলল, 'আপ্ জেহল্‌কা বড়া সাহেব, মায় আপ্‌কা কয়েদী—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আজকার সন্ধ্যাটা অন্তত সে ব্যবধান আমাদের না-ই বা রইল খাঁ সায়েব।'

এর পরেই আর কিছু না বলে সে সোজা চলে গেল তার কাহিনীতে।

সৈয়দ বংশের ছেলে। ঘরে খাবার-পরবার অভাব নেই। আফজল ছেলে-

বেলা থেকেই একটু খেয়ালী এবং বেপরোয়া। রূপ এবং স্বাস্থ্য—এর কোনোটাতেই খোদা তার বেলায় কার্পণ্য করেননি। তাছাড়া তার রাইফেলের নিশানা ছিল নির্ভুল এবং শিকারের নেশা দুর্নিবার। রুক্ষ, কঙ্করময় তাদের দেশ। কোথাও নেই একবিন্দু শ্যামলিমা। তবু অদ্ভুত মায়া ছিল তার সেই দেশের ওপর। বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে তার ভারী ভাল লাগত। এমনি এক উদ্দেশ্যবিহীন পথচলার ফাঁকে খেজুর বনের ছায়ায় তার সঙ্গে দেখা। মাথায় জলের ঘড়া। ফিরছিল দূরের কোন্ ঝরনা থেকে। আওরত; কিন্তু রক্ত-মাংসের নয়। বাস্‌রাই গোলাপের কোমল পাপড়ি দিয়ে তৈরি তার দেহ। আর মুখখানা? আফজলের মনে হ'ল, সেটাও ঠিক মুখ নয়, একটি সদ্য-স্ফুট শিশির-ধোয়া রক্ত গোলাপ। প্রথম দিন কোনো কথা হয়নি। হয়েছিল শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়। চোখের ভিতর থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে ঘাগরা দুলিয়ে সে উঠে গেল চড়াই পথ বেয়ে। আফজলও ফিরে এল। কিন্তু সে শুধু তার দেহ। তার সবটুকু দিল্ সে রেখে এল ঐ ঢালু পাহাড়ের বাঁকে।

তারপর আবার দেখা হ'ল। তারপর আবার; এবং তারপরে বারংবার। পরিচয় হ'ল। আস্তে আস্তে হ'ল প্রাণ দেয়া নেয়া। আসমানী—(নামটা আমার আমার দেওয়া নয়, বাবু সাব্ বলেছিল আফজল, ওর বাপ মা-ই রেখে গিয়েছিল। তা না হলে ঐ নামেই ডাকতাম আমি। সে তো দুনিয়ার নয়, আসমানের)—আসমানী কুমারী নয়, এক বৃদ্ধ রুগ্ন সর্দারের বিবি। সমস্ত দিন তার সেবা করে আর রূঢ় গঞ্জনা সয়ে সয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল একটু আলোর জন্যে, একটু হাওয়ার জন্যে। খোদা মেহেরবান্। তার জীবনের সেই আলো আর হাওয়া নিয়ে এল আফজল। ওর প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কোমল কণ্ঠে বীণার মৃদুতান তুলে এই ভাষায় সে কথা বলত। ঊষর উদাস মাঠের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে শুনে যেত আফজল, শুধু কান দিয়ে নয়, সমস্ত অন্তর দিয়ে।

একদিন কি খেয়াল হ'ল আফজলের। বলে উঠল, 'চল, তোমার সর্দারকে দেখবো।'

—কেন, সর্দারনীকে দেখে বুঝি আশ মিটছে না? চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল আসমানী।

—এইটুকুতে কি আশ মেটে, আসমান? গাঢ় স্বরে বলল আফজল।—

সবটুকু না পেলে দিল্ ভরে না. শুধু হাহাকার করে বুকের ভেতরটা।

কাছে টেনে নিয়ে আসমানীর মাথাটা সে চেপে ধরল বুকের উপর, যার ভিতরে তোলপাড় করছে তাজা রক্তের ঢেউ। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুষ্ক স্বরে বলল আসমানী, 'কিন্তু আমার যে হাত পা বাঁধা আফজল। এর বেশী তো আমার দেবার কিছু নেই।'

টস্‌টস্ করে মুক্তাধারার মত ঝরে পড়ল চোখের জল। আতর-মাখা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিল আফজল। হাত বুলিয়ে দিল আনার ফুলের মত কোমল পেলব দুটি রক্তাভ গণ্ডে।

একদিন সত্যিসত্যিই সর্দারকে দেখতে গেল আফজল। বারান্দায় খাটিয়ার উপর পড়ে আছে একটা বিপুল মাংসপিণ্ড। যেমন কুৎসিত, তেমনি অসভ্য লোকটা। ওকে দেখেই রুখে উঠল, 'কে তুমি? কি চাই?' তারপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, তুমিই বুঝি আমার সুন্দরী বিবির রোশনাই দেখে মেতে উঠেছ। সুবিধা হবে না, মিঞা সাহেব। একদিন স্রেফ পুড়ে মরবে। তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। বেঘোরে প্রাণটা দিয়ে লাভ কি?'

আফজলের কানে এর একটা কথাও যায়নি। সে দাঁড়িয়ে ছিল আচ্ছন্নের মত। এরই সঙ্গে ঘর করে আসমানী! ঐ কদাকার দেহটার পরিচর্যা করবার জন্যেই কি খোদা তাকে আসমান থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন?

ফিরবার পথে আসমানীর সঙ্গে দেখা। কি একটা বলতে গেল আফজল। কিন্তু গলায় তার স্বর ফুটল না। আসমানীর মুখে ম্লান হাসি। বলল, 'দেখলে আমার ঘর?'

—এ ঘর ভেঙে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে, আসমানী। চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। চলে যাই কোনো দূর দেশে। কেউ জানবে না, কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না।

—তোমায় তো বলেছি আফজল, সে উপায় আমার নেই। ঐ বুড়ো যদ্দিন বেঁচে থাকবে, এখান থেকে আমার নড়বার পথ বন্ধ।

—কেন?

—আমার বাবা যে আমাকে ঋণের দায়ে বাঁধা দিয়ে গেছে ঐ সুদখোর লোকটার কাছে। যতদিন ও ছেড়ে না দেয় ওর সংসারে থেকেই সে ধার আমাকে শুধতে হবে।

এ সমস্যার হঠাৎ কোনো সমাধান আফজলের চোখে পড়ল না। কিন্তু তার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল আসমানীর সেই অসহায় করুণ মুখখানা। সমস্ত চেতনার মধ্যে জেগে রইল শুধু একটি কথা—যেমন করে হোক, আসমানীকে বাঁচাতে হবে।

কিছু দিন কেটে গেল। পর পর ক'দিন নির্দিষ্ট গোপন স্থানে আসমানীর দেখা পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা হ'ল আফজলের। অসুখ বিসুখ করেনি তো? পরদিন আবার গিয়ে উঠল সেই সর্দারের বাড়ি। আসমানীর কোনো সাড়া নেই। ওকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বুড়ো সরদার, 'আবার এসেছিস, শয়তান?'

—কেন মুখ খারাপ করছ খালি খালি? ঝাঁঝিয়ে উঠল আফজল,—আসমানী কোথায়?

—ওঃ, বড্ড দরদ দেখছি, বিকৃত কণ্ঠে বলল সর্দার। তারপর গর্জে উঠল, আসমানী কোথায়, তা জেনে তোর কি হবেরে, কুত্তা?

—খবরদার! গাল দিও না বলছি, রুখে উঠল আফজল।

—তবে রে! হারামীকা বাচ্চা!

খাটিয়ার পাশে ছিল নাগরা। তারই একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আফজলের দিকে। জুতোটা সজোরে গিয়ে লাগল ঠিক তার মুখের উপর। আফগান রক্ত টগবগ করে উঠল। এক মুহূর্ত কি ভাবল আফজল খাঁ। তারপর ছুটে গেল বাইরে। দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল তার গুলি-ভরা রাইফেল। তুলে নিয়েই টেনে দিল ট্রিগার। অব্যর্থ সন্ধান।

হঠাৎ কিছুক্ষণ যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল আফজল। তারপর দেখল খাটিয়ার উপর পড়ে আছে সর্দারের রক্তাক্ত অসাড় দেহ। তার উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আসমানী। তার বুকের বসন ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখের তারা থেকে ঠিকরে পড়ল অগ্নিশীখা। তীরের মত ছুটে এল তীক্ষ্ণ স্বর—'নির্লজ্জ, কাপুরুষ! মনে করেছ আমার স্বামীকে খুন করলেই আমি তোমার হাতে ধরা দেবো! এই ছিল তোমার মতলব, না?'

শান্ত অনুনয়ের সুরে বলল আফজল, 'বিশ্বাস কর আসমানী। কোনো মতলব নিয়ে আমি আসিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু তার জন্যে তোমার স্বামীকে খুন করবো! না-না। শুধু

অপমান সইতে না পেরে রাগের মাথায়—'

—বেরিয়ে যাও, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত গর্জে উঠল আসমানী, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। খুনী, ডাকু, শয়তান...

সেইদিনই কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানের পথে বেরিয়ে পড়ল আফজল খাঁ।

আফজল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আসল কথা কি জানো, সাহেব, নিজের মনটাকেই বুঝতে পারেনি আসমানী। ঐ বুড়ো জানোয়ারটাকে সে যে কতখানি ভালবেসেছিল সেটা প্রথম জানতে পারল তখন, যখন তার বুকের পাশ দিয়ে বিঁধে গেছে আমার রাইফেলের গুলি।'

শহরের উপকণ্ঠে ওদের যে-দলটা ছিল, ওর জেল হবার পরেও তারা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত আফজল খাঁর সঙ্গে। ইদানীং আর আসেনি। হয়তো তারা উঠে গেছে অন্য কোথাও। কিংবা হয়তো দেখা করার প্রয়োজন আর নেই। আফজল খাঁর ঘরে সেই সন্ধ্যাটি যেদিন কাটিয়ে এলাম তার কদিন পরেই একজন দর্শনপ্রার্থী এসে উপস্থিত। হাঙ্গার স্ট্রাইক যারা করে বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিষিদ্ধ। সুতরাং মোলাকাতের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হবার কথা। তবু লোকটাকে ডেকে পাঠালাম। চেহারা এবং পোশাক দেখে মনে হ'ল সে পাঠান। বলল, আফজল ওর ছেলেবেলার দোস্ত্, দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে কিছু, পাশাপাশি গ্রামে বাড়ি। জেলের মধ্যে না খেয়ে আছে, এই খবর পেয়ে দেশ থেকে ছুটে এসেছে ওকে একবার দেখবার জন্যে। এবার হুজুর অর্থাৎ আমি যদি দয়া করে—তার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই তার চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম 'আসমানীকে চেনো?'

লোকটার মুখে পড়ল বিস্ময়ের ছায়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'চিনি। কিন্তু হুজুর তাকে—'

—কোথায় আছে সে?

—আছে আমাদের দেশেই। আগের মরদটা খুন হবার পর নিকা করেছে তারই এক চাচ্‌তো ভাইকে।

আমাকে নীরব দেখে যোগ করল, সেই শয়তানীটার জন্যেই তো দোস্ত্‌কে দেশ ছাড়তে হ'ল। একদিন খুব ভাব ছিল দুজনের। তারপর কী যে হ'ল ওরাই জানে। হঠাৎ রটিয়ে দিল, তার বুড়ো সর্দারকে নাকি খুন করেছে আফজল।

লোকটা কিছু কিছু উর্দু জানে। আর একটু কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, 'দ্যাখ খাঁ সাহেব, তোমার দোস্তের অবস্থা ভাল নয়। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে। কিন্তু জেলের মধ্যে যারা খানা ছেড়ে দেয়, বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের দেখা করবার হুকুম নেই। তোমার বেলায় সে হুকুম আমি দিতে পারি—'

খাঁ সাহেব কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর কা মেহেরবানি।'

বললাম, 'কিন্তু সে মেহেরবানি আমি দেখাতে পারি শুধু এক শর্তে।' শর্তের বর্ণনা দিলাম। শুনে মুখ চুন হয়ে গেল পাঠান সর্দারের। মাথা নেড়ে বলল, 'একথা আমি বানিয়ে বলবো কেমন করে? এর কোনোটাই যে সত্যি নয়।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'বেশ, না বলতে পার; বলো না। তোমার দোস্তের সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হ'ল না।'

কিছুক্ষণ আপন মনে কি ভাবল পাঠান। তারপর বলল, 'আমি রাজী।'

আমি নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম হাসপাতালের সেই ঘরটিতে। ঘরে ঢুকবার আগে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম সেই শর্তের কথা— 'দেখো খাঁ সায়েব, জবান দিয়েছ। কথার খেলাপ যেন না হয়।'

—কভ্‌ভি নেই—দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করল পাঠান।

ভাষাহীন দুটি ঘোলাটে চোখ দিয়ে দোস্তের মুখের দিকে চেয়ে রইল আফজল। যেন ঠিক চিনতে পারছে না। পাঠানের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলল, 'নিজের হাতে কেন জান দিচ্ছিস, দোস্ত? এই দেখবো বলেই কি অতদূর থেকে ছুটে এলাম। কি জবাব দেবো তোর মার কাছে? সে বুড়ী যে—'

গলায় একটা কাশির শব্দ তুলে আর একবার জানিয়ে দিলাম আমার শর্ত। চকিতে আমার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার সে চোখ ফেরাল দোস্তের মুখের উপর। বলল, 'তোর আসমানী যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল, আফজল।'

—কি বললি ?—যেন কবরের ভিতর থেকে উঠে এল ভগ্নস্বর। নিষ্প্রভ চোখের তারায় ফিরে এল এক ঝলক প্রাণের জ্যোতি; মরণাহত মুখে এক-বিন্দু রক্তের আভাস। আর একটু কাছে সরে গিয়ে বলল পাঠান সর্দার, 'তুই তো চলে এলি, দোস্ত; আর আসমানী আজও তোর পথ চেয়ে বসে আছে। নিকে করবার জন্যে কত সাধাসাধি। খানদানি ঘরের কত জোয়ান ছেলে। ফিরেও দেখল না। তার মুখে শুধু ঐ এক কথা—সে ফিরে আসুক আর নাই আসুক, তার জন্যেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

আফজলের চোখ ছাপিয়ে শীর্ণ গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। বুকের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এল গভীর নিঃশ্বাস। শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে বাল্যবন্ধুর একটা হাত ধরে বলল, 'সেই এলি, আর কদিন আগে এলি না কেন দোস্ত্ ? বড্ড দেরি হয়ে গেছে' ভাই, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

এবার এগিয়ে এসে বললাম আমি, 'কে বললে দেরি হয়ে গেছে ? আমি বলছি, তুমি বেঁচে উঠবে। আবার দেশে ফিরে যাবে। যাকে চাও, তাকে নিয়েই ঘর বাঁধবে।'

—হ্যাঁ সাহেব, সেই দোয়া কর। আমি বেঁচে উঠতে চাই,—তীব্র আগ্রহের সুরে বলল আফজল;—আমার তো মরলে চলবে না। দাও তোমাদের কি খাবার আছে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার পর আফজল খাঁকে যখন হাজির করা হ'ল হাংগার স্ট্রাইকের মত মারাত্মক অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করবার জন্যে, সে হঠাৎ ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার হাতে যা কিছু শাস্তি আছে সাহেব, সব মাথা পেতে নেবো। ডাণ্ডা বেড়ি, খাড়া হাতকড়া, ডিগ্রি বন্ধ, যা তোমার ইচ্ছে। শুধু যে-কটা রোজ মাপ পেয়েছি, সাত বছরের সাজা থেকে, সেটুকু যেন কেড়ে নিও না। যত তাড়াতাড়ি পার, আমাকে যেতে দাও। তুমি তো সবই জানো।

## ॥ সাত ॥

—এই নিন।

—কী দিচ্ছেন?

—আপনার কিঞ্চিৎ নতুন খোরাক, বলে ও পাশের টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে ধরলেন আমার সহকর্মী বিশ্বনাথবাবু। ভাঁজ-করা কাগজখানা টেনে নিলাম। আজ সন্ধ্যায় যারা কোর্ট থেকে নতুন ভর্তি হ'ল, তাদেরই একজনের জেল-ওয়ারেন্ট। খুলে দেখা গেল, চুরির অপরাধে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড, এবং সেই সঙ্গে পনেরো বেত। ৩৮১ ধারার কেস। অর্থাৎ চোরটি বাইরের লোক নয়, বাড়ির চাকর।

—হুইপিং দেখেছেন আপনি?—প্রশ্ন করলেন বিশ্বনাথবাবু।

বললাম, 'বেতমারা তো? তা দেখেছি বৈকি। গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলাম তিন বছর।'

—না, না; সে বেত নয়, জেলখানার বেত।

—আজ্ঞে না; সে সৌভাগ্য এখনো হয়নি।

—এইবার হবে। দেখবেন সে কি কাণ্ড! আর 'দেখবেন' বলছি কেন, দেখাবেন। মানে, আপনারই কাজ ওটা। সব ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।

পরদিন সকালেই কয়েদীটির দেখা পেলাম 'কেস্-টেবিলে'। ১৭।১৮ বছরের জোয়ান ছোকরা। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে লম্বা টেরি। নাকটা বাঁশীর মত। তার নীচে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা।

—আপীল করবে?—প্রশ্ন করলাম যথারীতি।

বিনা-দ্বিধায় উত্তর এল, 'না।'

সুতরাং জেল কোডের বিধান মতে এক পক্ষ পরে বেত্রদণ্ডের দিন স্থির করে ফেললাম।

সকাল থেকেই শুরু হ'ল আয়োজন। জেলের মাঝামাঝি একটি অনেক কালের নিমগাছ। তার নীচে খানিকটা খোলা জায়গা। চলতি নাম—নিম-তলা। সেই ছায়া-ঢাকা সিমেন্ট-বাঁধানো চত্বরে রোজ বড় জমাদারের দরবার বসে। তার চারদিক ঘিরে বড় বড় কয়েদী-ব্যারাক। বধ্যভূমির পক্ষে আদর্শ স্থান। সেইখানেই খাটানো হ'ল সেই বিচিত্র যন্ত্র, জেল-কোডে যার নাম whipping triangle, সিপাই-কোডে বলে 'টিকটিকি'। এই নামকরণের তাৎপর্য এবং ইতিহাস আমার জানা নেই। এমন একটা ভয়াবহ বস্তুর সঙ্গে এই ক্ষুদ্র নিরীহ প্রাণীর নামটা যে কেন যুক্ত হ'ল, সে গবেষণার জন্যে যোগ্যতর ব্যক্তির প্রয়োজন। কাঠ এবং লোহা দিয়ে তৈরি ন' ফুট লম্বা একটা ত্রিকোণ ফ্রেম। দেখতে খানিকটা ব্ল্যাক-বোর্ড স্ট্যাণ্ডের মত। তার সঙ্গে লাগানো উপরে দুটো লোহার কড়া আর নীচে দুটো বেড়ি। খানিক দূরে এনামেলের গামলা-ভর্তি ডাক্তারি রসায়ন। তার পাশে সারি সারি দুখানা বেত—লম্বায় হাত তিনেক, ব্যাস আধ ইঞ্চি। এক দিকে কাপড়ে জড়ানো বাঁট, ধরবার সুবিধার জন্যে।

—দুখানা কি হবে?—জিজ্ঞাসা করলাম সামনের কয়েদীটিকে।

—বলা যায় না, একটা যদি ভেঙে যায়?—উত্তর করল জমাদার।

সদলবলে সুপার এসে গেলেন। আসামীকে হাজির করা হ'ল তাঁর সামনে। প্রশ্ন করলাম, 'কি নাম?'

—মধুসূদন হালদার।

—কদ্দিনের সাজা?

—তিন মাস।

—আর?

—পনেরো বেত, থেমে থেমে বলল মধুসূদন। ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালো অদূরে দাঁড়ানো 'টিকটিকি' এবং তার পাশে শুইয়ে রাখা বেত দুখানার দিকে। দুজন মেট তাকে টেনে নিয়ে উপুড় করে ধরল পেছন-দিকে-হেলানো সেই ত্রিকোণ-

ফ্রেমের উপর। হাত এবং পা দুটো ছড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল সেই বেড়ির মধ্যে। তারপর শক্ত করে এঁটে দিল স্ক্রু। কোমরের উপর দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল চামড়ার বেল্ট। আগাগোড়া সমস্ত শরীরটা গাঁথা হয়ে গেল টিকটিকির সঙ্গে। খোলা রইল শুধু দুটি অঙ্গ—ঘাড় আর মাথা। বিবস্ত্র দেহ। শুধু কোমরের নীচে জড়িয়ে দেওয়া হ'ল সেই গামলাব জলে ভেজানো এক টুকরা পাতলা ন্যাকড়া।

এবার বীর বিক্রমে এগিয়ে এল বেত্র-জল্লাদ। ছ'ফুট লম্বা পেশোয়ারী। প্রস্থটাও দৈর্ঘ্যের সমানুপাত। নারীধর্ষণ মামলায় পাঁচ বছব সশ্রম দণ্ড নিয়ে সে এসেছিল জেলখানায়। কিন্তু অন্য সব কয়েদীর মত বাঁধা ধরা খাটনি বা task এই উষ্ণ-মেজাজ বেয়াড়া চেহারার লোকটার ঘাড়ে চাপানো হয়নি। দরজি কিংবা কাঠ-কামান বা ঐ জাতীয় একটা কিছু যথারীতি ওর টিকিটেও লেখা আছে। সেটা কাগজ-কলমের ব্যাপার। কার্যক্ষেত্রে জুম্মা খাঁ গোড়া থেকেই বড় সাহেবের ছত্রধর আর বড় জমাদারের বডিগার্ড। এই দুইটিই তার বৃত্তি। তার উপরে মাঝে মাঝে এই বেত্রদানের পবিত্র কর্তব্য। এতগুলো কঠিন দায়িত্ব-পালনের উপযোগী দৈহিক সামর্থ্য বজায় বাখতে হলে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রসদের প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে উদাসীন নন। তাই হাসপাতাল থেকে এক পোয়া মাংস এবং এক ছটাক মাখন তার দৈনিক বরাদ্দ।

একখানা বেত তুলে নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে যখন সে ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল, তার উল্লাস-দীপ্ত মুখের দিকে একবার চেয়েই স্পষ্ট বোঝা গেল মূল্যবান সরকারী খাদ্যের সার্থকতা প্রমাণ কবতে সে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

এক!—আকাশ ফাটিয়ে হুঙ্কার দিল বড় জমাদার। মুক্ত বাতাসে সন্ সন্ করে উঠল জুম্মা খাঁর বেত। তার মাথার উপরে একটা দ্রুত চক্কর দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পড়ল গিয়ে মধুসূদনের কোমরের নীচে।

আঁ—আঁ—আঁ......সঙ্গে সঙ্গে এক বিভৎস আর্তনাদ।

মানুষেব কণ্ঠে নয়, কোনো কোনো আহত জানোয়ারের কণ্ঠ থেকে শোনা যায় সেই নারকীয় শব্দ। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই হলদে রং-এর ন্যাকড়ার মাঝখানটা বসে গেছে মাংসের ভিতর। তার উপর ভেসে উঠেছে লাল রং-এর ছোপ।

দুই!—গর্জে উঠল জমাদার সাহেব। সপাং করে উঠল বেত এবং তার সঙ্গে আবার সেই জানোয়ারের মৃত্যু-নিনাদ। বেতের সংখ্যা যেমন এগিয়ে

চলল, ধীরে ধীরে নেমে এল গোঙানির পরদা। সাত-আট ঘা যখন পড়ে গেছে, তখন আর শব্দ নেই। নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম, বাঁচা গেল। এই চিৎকারটা যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। এবার তাকিয়ে দেখলাম ঘাড় সমেত মাথাটা ঝুলে পড়েছে ডান দিকে। হাত দুটো টান করে ঝুলিয়ে বাঁধা। হঠাৎ চোখের উপর ভেসে উঠল ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুখৃষ্টের সেই পরিচিত ছবি। কয়েদীটা ভাগ্যবান বলতে হবে।

ডাক্তার যিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর চাকরি বেশী দিনের নয়। লক্ষ্য করছিলাম, তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠেছে উদ্বেগের ছায়া। দু-একবার ইতস্ততঃ করে সুপারের কাছে গিয়ে কী বললেন। প্রবীণ লেপ্টেনান্ট্ কর্নেল হেসে উঠলেন, আই, এম, এস, সুলভ উচ্চাঙ্গের হাসি: বললেন, 'Oh, No, No. কিচ্ছু হয়নি। He is just creating a scene.'

—বি ক্লাস ঘুঘু তো, যোগ করলেন জেলর সাহেব।

কী ভাবছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে এল জমাদারের শেষ গর্জন— 'পন্দ্রো।' দেখলাম, বড় সাহেবের প্রসেশন ফিরে চলেছে। জুম্মা খাঁর হাতে বেত নেই, তার জায়গায় সেই সুবিশাল ছত্র। ডাক্তার টিকটিকির কাছে ছুটে গিয়ে চীৎকার করছেন, হাত পায়ের বেড়ি আর বেল্ট খুলে দেবার জন্যে। মেট দুটো সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে ধীরে সুস্থে কাজ করে যাচ্ছে। স্ট্রেচার পাশেই ছিল। তার উপর নামানো হ'ল মধুসূদনের অসাড় উলঙ্গ দেহ। ডাক্তার পাল্‌সে হাত দিলেন এবং স্ট্রেচার-বাহকদের তাড়া দিয়ে নিয়ে চললেন হাসপাতালের দিকে।

আফিসে ফিরবার পথে আমার মনে পড়ল ছেলেবেলার একটা ছোট্ট ঘটনা। আমার বয়স তখন বারো-তেরো। আমাদের গ্রামে জেলেপাড়ার দুধরাজ মাঝির বউকে ভূতে পেয়েছিল। অকারণে হাসত, চেঁচাত, গান করত, আবার পা ছড়িয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে বসত। গ্রামেরই মেয়ে, কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। যখন কুমারী ছিল, পুজা-পার্বনে আমাদের বাড়ি তাকে আসতে দেখেছি অনেকবার। ডুরে কাপড়-পরা শ্যামবর্ণ সুশ্রী মেয়েটি। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। মনে আছে, একটা কি কাজ উপলক্ষে জেলেপাড়ার মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল। আমার উপর ছিল পান পরিবেশনের ভার। সবাইকে একটা করে দিয়ে কী মনে করে ওর হাতে দুটো পান দিয়ে ফেলেছিলাম। ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। পাশে

ছিল এক বুড়ী, ওর দিদিমা কিংবা ঠাকুরমা। ব্যাপারটা তার চোখ এড়ায়নি। ওকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল, 'হাসছিস কেন হতভাগী? ছোটবাবুর তোকে মনে ধরেছে। পেন্নাম কর শীগ্‌গির।' বলামাত্র আমার পায়ের ওপর ঢিপ্‌ করে মাথা ঠেকিয়ে সে আরক্ত মুখে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়েকে ভূতে পেয়েছে শুনে কৌতূহল হ'ল, কষ্টও হ'ল। দেখতে গেলাম।

উঠানের মাঝখানে পিঁড়ির উপর আসন পাতা। পাশে একটা জলের ঘড়া, আরো কিসব জিনিসপত্র। এক বিকটাকৃতি ভূতের ওঝা বিচিত্র সাজে ঘুরে ঘুরে মন্ত্র পড়ছে, আর একটা প্রকাণ্ড ঝাঁটা দিয়ে ঘা দিচ্ছে আসনের উপর। কিছুক্ষণ পরে বৌটির ডাক পড়ল। দুজন লোক তাকে ধরে নিয়ে দাঁড় করাল উঠানের মাঝখানে। ওঝা হঠাৎ রুখে গিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিল খানিকক্ষণ, এবং তারপরই নির্মমভাবে ঝাঁটা চালাল তার পিঠের উপর। দু'চার ঘা লাগাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মেয়েটির কী কান্না! আমি আর সইতে পারলাম না। সামনে ছুটে গিয়ে বললাম, 'এসব হচ্ছে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলছ; পুলিসে দেব তোমাকে।' আমার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ সবাই হেসে আকুল। মেয়েটির বাপ ওখানেই ছিল। উঠে এসে আমার হাত ধরে বলল, 'তুমি এদিকে এস ছোটবাবু। ও ঝ্যাঁটা তো ময়নার গায়ে পড়ছে না, পড়ছে সেইটার পিঠে, যে ওর ওপর ভর করেছে। এবার সে নিশ্চয়ই পালাবে।'

চুরি অপরাধে মধুসূদনের উপর বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন যে-হাকিম, ময়নার বাপের মত তাঁরও বোধ হয় বিশ্বাস, বেত আসামীর দেহে পড়বে না, ঐ দেহের মধ্যে বাসা বেঁধেছে যে ক্রাইমের পোকা, পড়বে তারই উপর। ওতেই তারা মরবে। সুধন্য মাঝি যেমন আশা করেছিল, ভূত পালিয়ে গেলেই তার ময়না আবার সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তার ছোট্ট সংসারের মধ্যে, ফিরে পাবে কল্যাণী বধূর সুস্থ দেহ মন, মধুসূদনের হাকিমও ঠিক সেই ভরসাই করেছিলেন। অপরাধের বীজাণু ধ্বংস হলেই অপরাধী তার স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে ফিরে আসবে; নতুন করে গড়ে উঠবে তার নাগরিক নীতিবোধ। এই বিশ্বাস ছিল বলেই কিশোরী কন্যার রক্তাক্ত দেহ দেখে সুধন্য বিচলিত হয়নি; হাকিমও তাঁর কিশোর আসামীর বেত-জর্জর দেহের চিত্র অবিচল চিত্তে গ্রহণ করেছেন। আমি অবিশ্বাসী। তাই ওঝার ঝাঁটাকে

যেমন মেনে নিতে পারিনি, জম্মা খাঁর বেতকেও তেমনি স্বীকার করতে পারলাম না।

এর কিছুদিন আগেই ক্রাইম এবং তার শাস্তি সম্বন্ধে একখানা বই পড়েছিলাম। গ্রন্থকার অপরাধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লিখেছেন, ক্রাইম নামক বস্তুটিকে আমাদের পিতামহেরা যে চোখে দেখতেন, আমাদের দৃষ্টি তার চাইতে অনেক উদার। তখনকার দিনে অপরাধী যে দণ্ড পেত, তার মূলে ছিল প্রতিশোধ। Tooth for a tooth and eye for an eye—এই ছিল তাদের দর্শন। তুমি আমার দাঁত নিয়েছ, আমিও তোমার দাঁত নেবো, চোখের বদলে নেবো চোখ। যে হাত দিয়ে তুমি পরধন হরণ করেছ, সে হাত তোমার কেটে নিলাম—চুরি অপরাধে এই ছিল রাজদত্ত শাস্তি। কারো দেহে তুমি আঘাত করেছ, কেড়ে নিয়েছ কারো প্রাণ, বিনিময়ে তোমারও মাংস ছিঁড়ে খাবে হিংস্র কুকুর, তোমার প্রাণ দিতে হবে ঘাতকের হাতে কিংবা শূলের উপর।

প্রাচীন শাস্তি-প্রণালীর এমনি ধারা বহু নৃশংস দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তারপর বলেছেন ভদ্রলোক, দণ্ডনীতির এই চণ্ডমূর্তি আজকার মানুষের কাছে বিভৎস বর্বরতা। শাস্তি আজ আর retributive নয়, reformative. আধুনিক মানুষের কাছে ক্রাইম একটা ব্যাধি মাত্র। সেই ব্যাধিকে বিনাশ করে অপরাধীকে নিরাময় করে তোল। তার জন্যে যতটুকু কঠোরতা দরকার, তার বেশি যেন তাকে সইতে না হয়। তার সমাজ-বিরোধী আচরণকে সমাজ-কল্যাণের দিকে মোড় ফিরাতে হলে যে ন্যূনতম অবরোধ বা সামান্যতম বল প্রয়োগের প্রয়োজন সেইটুকুই হ'ল শাস্তি। দণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য অপরাধীকে সমাজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেদিন মধুসূদনের বেত্র-চিকিৎসা স্বচক্ষে উপভোগ করবার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এইসব জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব হজম করা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা হ'ল, তাঁকে ডেকে এনে বলি, বর্তমান দণ্ড-প্রণালীর স্তবগান করবার আগে একবার আমাদের বেত্রপাণি জম্মা খাঁকে দেখে যান। দেখিয়ে দিয়ে যান, পিতামহদের যুগ থেকে কোথায় কতটুকু আমরা উদার এবং অগ্রসর। তারা যদি অপরাধী নামক জীবটাকে উলঙ্গ করে বন্য পশুর মুখে ফেলে আমোদ পেয়ে থাকেন, আমরাও সেই হতভাগ্য প্রাণীটাকে বিবস্ত্র করে নর-পশুর কবলে ফেলে তারচেয়ে কম আনন্দ পাই না। সেখানে তার মাংস ছিঁড়ে

নিয়েছে সিংহ কিংবা কুকুরের দাঁত, এখানে সেই মাংস তুলে নিচ্ছে জম্মা খাঁর বেত। তারা গলায় কোপ মেরে নামিয়ে দিয়েছেন, আমরা গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছি। তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু এই—তাঁরা যেটা করেছেন, সহজ সরল পথে বিনা দ্বিধায় করে গেছেন, আমরা সেই একই জিনিস করছি, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড় বড় তত্ত্বকথার আড়াল দিয়ে। তাঁরা বেতটাকে বেত ছাড়া আর কোনো রূপে দেখেননি, এবং মেরেছেন মারবার জন্যেই; আমরা মারছি আর বলছি, এ বেত নয়, বেতরূপী কল্যাণ।

ঝাঁটা খেয়ে ময়নার ঘাড় থেকে ভূত বিদায় নিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। কেন না, ক'দিনের মধ্যে সে নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেইদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর তুলে নিয়ে যে শয্যায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল, সে শয্যা থেকে সে আর ওঠেনি। মধুসূদন কিন্তু হাসপাতালের বেড ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এল এবং তার ক'দিন পরেই দেখলাম, সে জেলের বাইরে দুনম্বর "জলভরি দফায়" ভর্তি হয়ে বাবুদের বাসায় জল টানছে। নামে "জলভরি" হলেও এসব "দফা" বা কয়েদীগোষ্ঠীর কর্মক্ষেত্র শুধু জল ভরাতেই সীমাবদ্ধ থাকত না। গৃহিণীদের খাস এলাকায় অর্থাৎ রান্না, ভাঁড়ার এবং কলতলাতেও ছিল তাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। আস্তে আস্তে কি করে জানি না, একদিন সে আমার বাড়িতে এসে পড়ল। জেলর সাহেব বললেন, 'মধুসূদনের ইতিহাস যেটুকু জানলাম, তোমার ঐ Bachelor's den ছাড়া ওকে আর কোথাও রাখতে ভরসা পাই না।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। উনি পরিষ্কার করে বললনে, 'ওর কেসটা জান তো? হার চুরি। তোমার বাড়িতে সে বালাই নেই।'

বললাম, 'একবার হার নিয়েছে বলে, ঘড়ি বা কলম সে কখনো নেবে না এমন কিছু গ্যারান্টি আছে কি?'

—তা আছে, অন্ততঃ ওর বেলায়। যদ্দূর শুনেছি, ওর নজরটা ঠিক হারের দিকে ছিল না, ছিল হার যারা পরেন এমন একজনের দিকে। তোমার তো সে গুড়ে বালি। অতএব শ্রীমধুসূদন তোমার সহায় হউন।

সকালে ইক্‌মিক্‌ কুকারে চাল ডাল আর একটা কিছু সেদ্ধ-টেদ্ধ চাপিয়ে আপিসে চলে যেতাম। বারোটায় ফিরে নামিয়ে নিয়ে কোনো রকমে গলাধঃকরণ—এই ছিল আমার জীবনযাত্রা। সেদিন এই পর্ব যখন শুরু করতে যাচ্ছি, মধুসূদন বলল, 'আপনি যান বাবু, ওসব আমি ধরে রাখবো।'

বললাম, 'তুমি পারবে ?'

মধু ঘাড় নাড়ল।

আফিস থেকে যখন ফিরলাম, মধুসূদন তার আগেই ভিতরে চলে গেছে। স্নান সেরে খেতে গিয়ে দেখি, কুকার নেই। তার যায়গায় পরিপাটি করে আসন পাতা। পাশে জলের গ্লাস, সামনেই ঢাকা দেওয়া ভাতের থালা, চার-দিকে বাটি করে সাজানো দু'তিনটা তরকারী। ইক্‌মিকের বোঁটকা গন্ধ নেই। সুপাচ্য সুস্বাদু খাদ্য। দুপুরবেলা ও আসতেই বললাম, 'এত সব কান্ড করতে গেলে কেন তুমি ? ঐ কুকারেই আমার চলে যেত।'

মধু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'খাবার মত হয়েছিল, বাবু ?'

—খাবার মত মানে! চমৎকার রেঁধেছ তুমি। দ্যাখ না, কিচ্ছু পাতে পড়ে নেই।

অতঃপর ইক্‌মিক শিকেয় উঠলেন। তার যায়গায় পাকাপাকি বহাল হল মধুসূদন হালদার। খাওয়াটা শুধু উদরপূর্তি নয়। বাড়তি যেটুকু, সেটা যে আপনার জন ছাড়া অন্য কারো কাছেও পা'ওয়া যায়, এই প্রথম তার পরিচয় পেলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এতসব রান্না তুই কোথায় শিখলি মধু ? আর এরকম যত্নআত্তি ?' মধু লজ্জিত হল—'যত্নআত্তি আর কোথায় করছি বাবু ? রান্না যেটুকু জানি, গিন্নী-মার কাছে শেখা। বড় ভালবাসতেন আমাকে।'

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'আর সেই গিন্নী-মার হারটা তুই চুরি করে বসলি।'

মধু যেন একটু আহত হল। মাথা নীচু করে বলল, 'হারটা গিন্নীমার নয়, তার মেয়ের। আর চুরিও আমি করিনি, বাবু।'

—তবে ?

—সে অনেক কথা। এক দিন সব বলব আপনাকে।

সে "এক দিন" আসতে দেরি হল না। কিন্তু কথা যেটুকু বলা হল সে "অনেক" নয়, সামান্যই। অনেক হয়তো রয়ে গেল তার না-বলা কথা।

বাপ মারা যাওয়ার পর সংসার চলেনা। গুটি তিনেক ভাইবোন নিয়ে মা বিব্রত হয়ে পড়লেন। মামার সঙ্গে মধুসূদন কলকাতায় এল চাকরির খোঁজে। উঠল এসে মামার কাছেই হাওড়ার এক বস্তিতে। মাস

খানেকের মধ্যেই এই কাজটা জুটে গেল। ছোট্ট পরিবার। বাবু ঠিক দশটায় ডালভাত খেয়ে ট্রামে করে বেরিয়ে যান কলকাতার কোন্ আফিসে। তার পরই ইস্কুলে যায় দিদিমণি—চৌদ্দ পনর বছরের মেয়ে, ঝর্ণা। মাইল দেড়েক পথ। মধুকেই পৌঁছে দিতে হয়, আবার নিয়ে আসতে হয় সেই চারটের সময়। বাড়িতে থাকেন গিন্নীমা আর বছর চারেকের ছেলে পল্টু। ঠিকা ঝি আছে; বাসন মাজে, ঘর মোছে, বাটনা বাটে। বাকী সব কাজ মধুর। গিন্নী বার-মেসে হার্টের রুগী। সকালে কোনো রকমে ডাল-ভাত ফুটিয়ে তার সংগে দু'খানা ভাজা কিংবা একটু আলু সেদ্ধ দিয়ে স্বামী আর মেয়েকে রওনা করে দেন। আর পেরে ওঠেন না। মাছ এবং অন্য দু-একটা বিশেষ পদ রাঁধতে হয় মধুকে। তিনি কাছে বসে দেখিয়ে দেন। বাবুর ফিরতে রাত হয়। ঝর্ণা চারটেয় ফিরে জলখাবারের বদলে ভাত খায়। উপকরণের অভাব ঘটলে মুখ ভার হয়ে ওঠে। মাকে কিছু বলে না। মধুর সংগে কথা বন্ধ হয়ে যায়। ওব নিজের কোনো কাজ করতে এলে বলে, 'এটা আমিই করে নিতে পারবো। তোমাকে আর দয়া করে আসতে হবে না।'

মধু মুখ টিপে হাসে; বলে, 'কাল কিরকম কাট্‌লেট করবো, দেখো। দেখি কখানা খেতে পার।'

—চাই না, ঠোঁট উলটে জবাব দেয় ঝর্ণা।

পরদিন দু'খানার জায়গায় চারখানা কাট্‌লেট পড়ে তার পাতে। সবটা চেঁছে মুছে খেতে খেতে বলে মধুকে শুনিয়ে শুনিয়ে, 'কী কাট্‌লেটই না হয়েছে! খালি ঘি মসলার শ্রাদ্ধ!'

মধু মুচকি হেসে তার কাজে চলে যায়।

একদিন ইস্কুলের ছুটির পর বেরিয়ে আসতেই রোজকার মত বইগুলো যখন ওর হাত থেকে নিয়ে নিল মধু, ঝর্ণা বলল, চল মধু, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।'

—আমার যে অনেক কাজ পড়ে আছে, দিদিমণি।

ঝর্ণা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আমি কিছু বললেই অমনি কাজের ওজর। বেশ; যেতে হবে না তোকে। আমি একাই যাব—বলে হাঁটতে শুরু করল গঙ্গার দিকে। মধুকে অনুসরণ করতে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাঃ, তোকে আবার কে আসতে বলেছে?'

মধু সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, 'থামলে কেন? চল না কোথায় যেতে

হবে। ফিরতে দেরি হলে আবার মা বকবেন।'

—ইস্! কারো বকুনি টকুনির ধার ধারি না আমি। আমার বেড়াতে ইচ্ছে হয়েছে, আমি বেড়াবো।

তেলকল ঘাটে জেটির উপর গিয়ে বসল দুজনে। কূলে কূলে ভরে উঠেছে ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা। মাঝখান দিয়ে একখানা স্টিমার চলে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল ঝর্ণা, 'একটা গল্প বল না, মধু।'

—আমি কি লেখাপড়া জানি যে গল্প বলবো ?

—লেখাপড়ার গল্প নয়, তোর দেশের গল্প, ছেলেবেলাকার গল্প।

নাছোড়বান্দা মেয়ে। অগত্যা বলতে হল মধুকে। ওর সেই মাছচুরির গল্প। গ্রাম থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে সরকারী বাঁধ। পাহারাগুলো ঘুমে বিভোর। মধু আর তার পাড়ার আর একটি ছেলে বংশী মস্ত বড় একটা কাৎলা কাঁধে করে যখন ফিরে আসছে, তখন অনেক রাত। এমন আঁধার যে নিজের হাত পা চোখে পড়ে না। বংশী আগে, পেছনে মধু। হঠাৎ উঃ মাগো বলে একটা চিৎকার দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটা। মধু তাকিয়ে দেখে ফনা উঁচিয়ে সাক্ষাৎ যম। কী তার গর্জন! মাথার উপরে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একটা মস্ত বড় মণি। তারই আলোতে দেখা গেল, বংশীর বুড়ো আঙ্গুল থেকে রক্ত পড়ছে। মাছ রইল পড়ে। কোনো রকমে তাকে কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল মধু। খানিকটা গিয়েই সাঁওতালদের পাড়া। ওর চিৎকার শুনে বেরিয়ে এল একদল মেয়েপুরুষ। খবর গেল গুণীনের কাছে। সাক্ষাৎ দেবতা বললেও চলে। ঝাড়া আরম্ভ হল। রাত যখন প্রায় কাবার, চেঁচিয়ে উঠলেন গুনীনঠাকুর—'যে যেখানে আছিস, সরে যা। সে আসছে।' সব ফাঁকা হয়ে গেল। রইলেন কেবল তিনি, আর পড়ে রইল বংশী। আরো কিছুক্ষণ ঝাড় ফুঁক করবার পর শোনা গেল সেই হিস্ হিস শব্দ। অত-দূরে বসেও আমাদের গা ছমছম করে উঠল। গুনীন্ মন্তর পড়ছে আর ডাকছে 'আয় বেটা, আয়।' আসতে কি আর চায় ? কিন্তু না এসেও উপায় নেই। মন্তরের জোরে টেনে আনল। সেই কাটা জায়গায় মুখ দিয়ে নিজের বিষ নিজেই তুলে নিল। তারপর কোথা দিয়ে যে চলে গেল কেউ জানতেও পারল না। গুনীনের ডাকে আমরা সব ফিরে এসে দেখি, বংশী উঠে বসেছে।

গল্প যখন শেষ হল, মধুর হঠাৎ খেয়াল হল ঝর্ণা কখন সরে এসে একেবারে তার গা ঘেঁষে বসেছে। বড় বড় চোখ তুলে বলল, 'সত্যি?'

—একেবারে নিজের চোখে দেখা, বললে মধুসূদন।

ওরা যখন বাড়ি ফিরল, সন্ধ্যা হয় হয়। দরজা খুললেন গিন্নী-মা— 'কোথায় ছিলি তোরা? সেই চারটা থেকে ঘর বার করছি।'

ঝর্ণা এগিয়ে গিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'একটু গঙ্গার ধারটা ঘুরে এলাম, মা। তুমি রাগ করেছ?'

—না, রাগ করবো কেন! রেগে উঠলেন মা, সেই কোন্ সকালে দুটো ভাতে ভাত খেয়ে মেয়ে আমার সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আসুন উনি বাড়ি। তোমাকে রীতিমত শাসন করা দরকার।

মধুকে বললেন, 'আর কোনোদিন ওকে গঙ্গার ধারে টারে নিয়ে যাসনে, বুঝলি? বাবু ও সব পছন্দ করেন না।'

সপ্তাহ না কাটতেই, আবার একদিন ইস্কুল থেকেই মাথা ধরল ঝর্ণার। গঙ্গার হাওয়া না লাগালেই নয়। মধুরও বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না। আজ আর জেটিতে নয়, দূরে একটা নির্জন জায়গা দেখে ঘাসের উপর বসল পাশাপাশি। আজও গল্প বলতে হল মধুকে। যাত্রার দলের সঙ্গে পালিয়ে যাবার কাহিনী। সেই দেশ বিদেশে গান গেয়ে বেড়ানো। প্রথমেই কি আর গাইয়েদের দলে ঢুকতে পেরেছিল? কতদিন শুধু তামাক সেজে, অধিকারীর গা হাত পা টিপে, রান্না করে, তার পর। গল্প যতক্ষণ চলল, মধুর কাঁধের উপর মাথা রেখে চুপ করে রইল ঝর্ণা।

তারপর আবেশ-জড়ানো সুরে বলল, 'সত্যিই বড্ড মাথা ধরেছিল আজ। তোর গল্প শুনে একদম ছেড়ে গেছে। বড্ড ভালো লাগছে, মধু।'

মধুর কানে হল মধু-সঞ্চার: সর্বদেহে খেলে গেল বিদ্যুৎ শিহরণ।

দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবু। মাথা নিচু করে দু'জনে এসে দাঁড়াল সেইখানে। খুকী ওপরে যাও, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। তারপর মধুসূদনের কান ধরে টেনে নিলেন ভিতর দিকে। চোখ পাকিয়ে বললেন, 'আর কোনদিন ওকে নিয়ে কোথাও গেছ যদি শুনতে পাই, চাবুক মারতে মারতে বের করে দেবো। মনে থাকে যেন।...'

কিন্তু মনে থাকল না। এর পরে একদিন ক্লাস পালিয়ে বেরিয়ে এল ঝর্ণা। ট্রামে চড়ে ওরা চলে গেল বোটানিক্যাল গার্ডেন। গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে বসল এসে পদ্মপুকুরের ধারে। কেউ কোথাও নেই। শুধু দূরে কোন্ গাছের উপর থেকে ভেসে আসছিল অচেনা পাখীর ডাক। মধু তন্ময় হয়ে বলছিল তার জীবনের আর একটা কোন্ দুঃসাহসের কাহিনী। তার হাঁটুর উপর চিবুক রেখে ঘাসের বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল ঝর্ণা।

সেইদিন রাত সাড়ে সাতটায় বাড়ি ঢুকতেই মধুসূদনের জবাব হয়ে গেল। তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাবার হুকুম। বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে যখন নীচে নামছিল, কানে এল গিন্নীমার গলা, 'ছেলেটাকে যে তাড়িয়ে দিলে, ওর দোষটা কি শুনি? মেয়ে যে তোমার ধিঙ্গীপনা করে বেড়াচ্ছেন, সেটা দেখতে পাওনা?' 'দেখতে আমি সবই পাই, গিন্নী', গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন বাবু; 'কিন্তু মেয়েকে তো আর এভাবে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাকে যায়, তাকে দিলাম। মেয়ের ব্যবস্থাও করছি।'

টিনের সুটকেসটা হাতে করে মধু গেল গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি রান্না করছিলেন। বললেন, খেয়ে দেয়ে রাতটা থেকে কাল সকালে যাস্।

মধুর কণ্ঠা পর্যন্ত ঠেলে উঠল কান্না। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বলল, 'না, মা, আমার খিদে নেই। আমি যাই।'

তিনি আর কিছু বললেন না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন মধুর দিক থেকে।

রাত কাটল ফুটপাথে। সকালে উঠে একবার ভাবল, মামার কাছে যায়। কিন্তু, চাকরি গেল কি করে—এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে সে? দেশে ফিরে যাওয়া আরও অসম্ভব। তাছাড়া টাকাও নেই। মাইনে যেটা পাওনা ছিল, আগেই নিয়ে নিয়েছে। আসবার সময় পেয়েছে শুধু কয়েক আনা পয়সা। তারই খানিকটা খরচ করে চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে নিল। তারপর পার্কে শুয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে কেটে গেল বেলা। তিনটা বাজতেই সে উঠে বসল। তারপর কিসের এক অলক্ষ্য টানে তাকে নিয়ে গেল সেই পুরানো রাস্তায়। ইস্কুলের গেটটা নজরে পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠল মধু। পা দুটো দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল ঝর্ণা। ইস্কুল তখনো

ছুটি হয়নি। সোজা এগিয়ে এসে বলল, 'তুই এসেছিস, মধু? ঈস্ বড্ড মুখ শুকিয়ে গেছে! খাসনি বুঝি কিছু?'

মধু হাসবার মত মুখ করে বলল, 'খেয়েছি বৈকি।'

ত্রস্ত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল ঝর্ণা, 'ঝিটা এখনই এসে পড়বে। এ পাশে আয়।' দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ইস্কুলের পিছন দিকে। মধু চলল তার সঙ্গে। একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিল ঝর্ণা। তারপর গলা থেকে হারছড়া খুলে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে মুঠোটা বন্ধ করে দিল। বলল, 'এটা রাখ। বিক্রী করে চালিয়ে নে যদ্দিন কাজ-টাজ না জোটে। টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার আসিস, বুঝলি?'

মধু আপত্তি জানাল, 'ওরা যে তোমাকে বকবে, দিদিমণি। না, না, এ হার তুমি—'

—'আচ্ছা সে আমি বুঝবো', বাধা দিয়ে বলল ঝর্ণা; 'তুই এখন যা'—বলে সে মিলিয়ে গেল মেয়েদের দলের মধ্যে। ইস্কুলে তখন ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেছে।

মধু দেখল, মামার কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এটা সে বুঝেছিল, সে না খেয়ে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু ঝর্ণার হার বিক্রী করতে পারে না। সে রাত্রে মামার বাসায় শুয়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত তার চোখে ঘুম এল না। যখন এল, সে ঘুম শুধু সুখ-স্বপ্নে ভরা। তারই মধ্যে কানে এল কে যেন বাইরে থেকে দরজা ঠেলছে। তার মামা উঠে খুলে দিয়েই কাঠ হয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস।

জেল হাজতে আর যেতে হল না। মামার চেষ্টায় জামিন হয়ে গেল থানা থেকেই। কিছুদিন পরেই মামলা উঠল কোর্টে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন ঘুম ধরে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা ডাক কানে যেতেই চমকে উঠল মধু। ওদিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। সাক্ষীর মঞ্চে উঠে এল ঝর্ণা। চোখদুটো ফুলো ফুলো। সমস্ত মুখময় বিষণ্ণ অন্ধকার। আরও বেশী চমকে উঠল যখন শুনল, কোর্টবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলে যাচ্ছে ঝর্ণা—'হ্যাঁ; ঐ আসামী আমার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এই হার, অমুক দিন বেলা চারটার সময় যখন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। তার আগের দিন বাজারের পয়সা চুরি করার জন্যে বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ; সন্ধ্যা বেলা এসে ও আমাদের সবাইকে শাসিয়ে গিয়েছিল।......'

তারপরে এল এক ঝি। মধু তাকে কোনোদিন দেখেনি। থেমে থেমে বলল, 'হ্যাঁ' আমি ছিলাম দিদিমণের ঠিক পেছনে। হার ছিনিয়ে নিয়ে ঐ লোকটা যখন পালাচ্ছে, আমি চোর চোর বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে ও মিশে গেল, দেখতে পাইনি।

হাকিম রায় দিয়ে দিলেন।

তিনমাস দেখতে দেখতে কেটে গেল।

খালাসের আগের দিন মধুকে ডেকে বললাম, 'চাকরিই যখন করবি, আমার এখানেই থেকে যা না? মাইনে, ওখানে যা পেতিস, তাই নিস্।'

মধু খুশি হয়ে বলল, আমিও সেই কথা বলবো, ভাবছিলাম। আপনার কাছেই থাকবো আমি। দুটো দিন শুধু ছুটি দিন। বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি। মাকে অনেকদিন দেখিনি। ভাইবোনগুলোকেও দেখতে ইচ্ছা করে।'

বললাম, 'বেশ; তাই বরং ঘুরে আয়।'

দুদিন নয়, তিনদিনের দিন সন্ধ্যা বেলা ঘুরে এল। আমার বাড়িতে নয়, জেলগেটে; কোমরে দড়ি-বাঁধা হাজতি আসামীদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

পরদিন দুপুর বেলা নির্জন আফিসে মধুকে ডাকিয়ে নিয়ে এলাম। এবার যে কাহিনী শুনলাম, সেটা ওর নিজের কথাতেই বলি—

'অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরছি। সবাই ছুটে আসবে; তা, না; আমাকে দেখেই মা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ভাইবোনগুলোও, মনে হল যেন ভয় পেয়েছে। খবর শুনেই পাড়ার লোকজন আসতে লাগল একে একে। আমার এক পিসীমা বললেন, 'হ্যারে মধু, পনেরো ঘা বেত তুই সইতে পারলি? দেখি, কোথায় মেরেছে? দাগ আছে এখনো?'

আরেক জন, আমার সম্পর্কে কাকা হন, বললেন, 'জেলে শুনেছি গরুর বদলে মানুষ দিয়ে ঘানি টানায়। তেল কম হলে চাবুক মারে। সত্যি নাকি রে? ঘানি টেনেছিস তুই?'

কে একজন ছোকরা বলে উঠল ভিড়ের ভেতর থেকে, 'জেলখানায় নাকি

হাতা মেপে ভাত দেয়। মোধোটার চেহারা দেখে তা তো মনে হচ্ছে না।'

'ও, তা জানিস না বুঝি?'—বললেন আমার এক জ্ঞাতিদাদা, 'ওখানেও চুরি চলে। সিপাইদের পা টিপে দিলে দু-একহাতা ভাত বেশি দেয়।'

খেয়ে দেয়ে যখন শুতে গেছি, মা এসে বসল মাথার কাছে। বলল, 'হ্যারে মধু, তোর বাপ-দাদারা গরীব ছিল সবাই। কিন্তু প্রাণ গেলেও চুরি করেনি। তুই শেষটায় বংশের নাম ডোবালি, বাবা?'

আমি বললাম, 'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, মা। চুরি আমি করিনি।'

মা চুপ করে রইল। বিশ্বাস করল না আমার কথা। তারপর আস্তে আস্তে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব লেগেছিল, নারে?'

আপনাকে সত্যি বলছি, বাবু, বেতের জ্বালা যে কী জিনিস এইবার তা টের পেলাম। বেত যখন মেরেছিল, সে-যন্ত্রণা এর কাছে কিছু না। ভোর হবার আগেই কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া স্টেশনে নেমেই দেখা হয়ে গেল ছেদীরামের সংগে। জেলে থাকতে আলাপ। বড় ভালবাসত আমাকে। তাকে সব বলেছিলাম। এবারকার কথাও বললাম। শুনে সে হেসে উঠল। তারপর বলল, তার সেই ভাঙা ভাঙা বাংলায়, 'তুই মরদ না আছিস, মধু। যে মাইয়া তোকে চাবুক দিল, জেল খাটাল, জান থেকে বড় যে ইজ্জৎ তাই চলে গেল, তার ইজ্জৎ তুই কেড়ে লে। দিল ঠান্ডা হোবে।'

কথাটা আমার মনে লাগল। বেত আর জেলের জ্বালা আর একবার জ্বলে উঠল বুকের মধ্যে। ঠিক বলেছে ছেদীরাম। আমার মুখে মিথ্যা দুর্ণামের চুনকালি লেপে দিয়ে ঐ মেয়েটা ঘরের আড়ালে বসে মনের সুখে ঘর সংসার করবে, সে হবে না। ওকেও টেনে আনবো পথের ধুলোয়। চাকরকে মেরে মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন আমার মনিব। সেটা হতে দেবো না। চাকরের মুখের কালি তার মেয়ের মুখেও লাগবে। দেখি তারপর কোথায় থাকে তার মান আর ইজ্জৎ।

ছেদীরাম আমার সংগী হ'ল। কথা রইল, ভেতরে ঢুকবো আমি একাই। ঐটুকু একটা মেয়েকে সামলাতে আর কারো দরকার হ'বে না। ও থাকবে বাড়ির বাইরে। কাজ সেরে যখন বেরিয়ে আসবো, কোনোদিক থেকে বাধা এলে, ছোরা চালাবে। খানিকটা দূরে একটা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে ট্যাক্সি। সে ব্যবস্থাও ছেদীরামের।

রাত তখন সাড়ে নটা। ছোট্ট গলি। লোকজন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেকদিন পরে মনিব বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। খানিক পরে খুলে গেল কপাট। ঢুকেই দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা। কিন্তু এ কী চেহারা! মনে হল যেন অনেকদিন অসুখে ভুগে উঠল। আমাকে দেখে প্রথমটা কেমন থতমত খেয়ে গেল। তারপর এগিয়ে এসে বলল, 'মধু? এদ্দিন পরে বুঝি মনে পড়ল! মনে মনে তোকে কত ডেকেছি, জানিস?' আমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ বেঁধে ফেলবার জন্যে যে ন্যাকরাটা হাতে নিয়েছিলাম, আস্তে আস্তে সেটা পকেটে পুরে ফেললাম। গলাটা পরিস্কার করে বললাম, 'মা কই, দিদিমনি?' 'মা?'—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ঝর্ণা, 'মা তো নেই। দু'মাস হ'ল চলে গেছে।'

—পলটু?

—পলটুকে মাসীমা এসে নিয়ে গেছেন। আমাকে বাবা যেতে দিলেন না। ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছেন। একটুও বেরোতে দেন না। জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন একটা দোজবরে বুড়োর সঙ্গে—

ছুটে এসে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাকে তুই নিয়ে চল, মধু। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো।'......

বাইরে কাশির শব্দ শোনা গেল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ঝর্ণার। 'ঐ বাবা ফিরলেন ক্লাব থেকে'—বলেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

বাবু বাড়ি ঢুকলেন। প্রথমে আমাকে চিনতে পারলেন না। কাছে এসেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও, জেলে গিয়ে আর বেত খেয়েও তোর লজ্জা হয়নি হারামজাদা! আবার এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে?'

বললাম, 'কী বকছেন পাগলের মত! সর্বনাশ আমি করছি, না আপনি করেছেন আমার সর্বনাশ?'

—তবে রে! একটা চাকরের এত তেজ!—বলে ছুটে এসে দিলেন গলা-ধাক্কা। পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ঠিক সেই সময়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল একটা ছোরা, বিঁধে গেল বাবুর বাঁহাতের উপর দিকে।

চেঁচামেচি শুনে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল। ছেদী-রামের চিহ্ন নেই। আমিও ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু বেশীদূর যাবার আগেই সবাই ঘিরে ফেলল। তারপর এই—'

গায়ের জখমগুলো দেখিয়ে দিল মধুসূদন।

ওয়ারেন্ট খুলে দেখলাম, চার্জ গুরুতর—নারীহরণ এবং নরহত্যার চেষ্টা। ৩৬৬/৫১১, তার সঙ্গে ৩০৭।

## ॥ আট ॥

পূব দিকে বর্মা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, মাঝখানে যে পর্বতসঙ্কুল ভূখণ্ড, তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। সাহেবরা বলতেন চিটাগঙ্ হিল্ ট্রাক্ট্স্। বাংলা দেশ। কিন্তু বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক; দৈহিক নয়, আত্মিকও নয়। বাংলার শ্যামলিমা আছে, নেই তার উন্মুক্ত বিস্তার। কোনো অবারিত মাঠের প্রান্তে নুইয়ে পড়ে না চুম্বনাকুল গগন-ললাট। কোনো আদিগন্ত নদীর বুকে নেমে আসে না স্খলিতাঞ্চলা সন্ধ্যা। বুকভরা মধু বধূ হয়তো আছে। কিন্তু কোনো স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজলে পড়ে না তাদের অলক্ত-রঞ্জিত চরণচিহ্ন।

এদেশেও জেল আছে। কিন্তু তার কৌলীন্য নেই। সে শুধু আকারে ছোট নয়, জাতেও ছোট। সুতরাং আমার চৌহদ্দির বাইরে। কর্মসূত্রের টান যখন নেই, তখন আর কোনো সূত্র ধরে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে কোনো-দিন আমার পদধূলি পড়বে, এরকম সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বের কোন্ কোণে কখন যে কার জন্যে বিধাতাপুরুষ দুটি অন্নের ব্যবস্থা করে রেখে দেন, সে শুধু তিনিই বলতে পারেন। যা ছিল স্বপ্নের অগোচর, তাই একদিন বাস্তব ঘটনার রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেট্‌ল্‌মেন্টের তাঁবু ঘাড়ে করে আমার এক আত্মীয় টোল ফেলে ফিরছিলেন এই দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হঠাৎ রোগশয্যায় পড়ে আমাকে স্মরণ করলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হল তার স্ত্রীর সাশ্রু অনুনয়। অতএব আমিও একদিন বাক্স বিছানা ঘাড়ে করে মঘের মুলুকে পাড়ি দিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম। গিয়ে দেখলাম, শুধু পার্বত্য নয়, আরণ্য চট্টগ্রাম। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দুর্ভেদ্য পাহাড় আর দুর্গম জঙ্গল। তারই বুক

চিরে চলে গেছে শীর্ণ জলরেখা। তার নাম নদী। একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির বুকের উপর থেকে কাঠ খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরি হয়েছে খোন্দল। তার নাম নৌকা। তারি মধ্যে বসে যেতে হল দিনের পর দিন। হঠাৎ একদিন অসময়ে নৌকা থেমে গেল। সামনে এপার ওপার জোড়া বাঁধ। মাঝিদের কলরব শুনে কৌতূহল হল। লক্ষ্য করে দেখি, বাঁধ নয়, গজেন্দ্রগমনে নদী পার হচ্ছেন পাহাড়ী পাইথন। আর একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। গলুইএর উপর বসে নিশ্চিন্ত মনে বেসুরো গান ধরেছি। মাঝির চাপা ধমক শুনে থেমে গেলাম। দশহাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জলপানরত চিতাবাঘ। শুধু আধি নয়, পথের বাঁকে লুকিয়ে আছে ব্যাধি। এমন জ্বর, যার কবল থেকে কাকেরও নিস্তার নেই। তারপর আছে মাছির ঝাঁক। ভীমরুলের চেয়েও বিষাক্ত। একবার ধরলে শুধু যন্ত্রণা নয়, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেবে ক্ষত।

রাঙামাটি শহর থেকে দিন তিনেকের পথ। একখানি বসতিবিরল পাহাড়ী গ্রাম। বনের ফাঁকে ফাঁকে দু-একখানা চালাঘর। জঙ্গল-মুক্ত ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ক্ষেত। সেখানে "ঝুম্" চাষ করে মেয়ে-পুরুষের মিলিত দল। লাঙ্গল গরুর বালাই নেই। অদ্ভুত হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে কিংবা আঁচড় কেটে একই সঙ্গে পুঁতে বা ছড়িয়ে দেয় ধান মকাই আর নানারকম সব্জির বীজ। যেমন যেমন তৈরি হয়, কেটে ঘরে তোলে ফসলের বোঝা।

আমার আত্মীয়টির আস্তানা ছিল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। আধ-মরা হয়ে আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তিনি তখন মরে সবে বেঁচে উঠেছেন। করবার বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার এই সশরীরে উপস্থিতি, এইটুকু দিয়েই যেন তাকে কৃতার্থ করে দিলাম। বললাম, 'একটা কিছু টনিক ঠনিক খেয়ে চট্‌পট্ সেরে ওঠো।'

উনি হেসে বললেন, 'তুমি কাছে বসে আছ; এইটাই আমার সব চেয়ে বড় টনিক। আর কিছু চাই না।'

সারাদিন তার টনিক জুগিয়ে বিকেল বেলা রোদ যখন পড়ে আসে, পাহাড়ী পথ ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। সেদিন অনেকটা দূরে চলে গিয়ে-ছিলাম। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল হয়নি। সঙ্গে ছিল সেট্‌ল্‌মেন্ট অফিসের এক চাপরাশী। অনুস্বার-কন্টকিত কি'একটা নাম, আজ আর

মনে নেই। যেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ওরই কাছাকাছি তার বাড়ি। দ্বিতীয়-বার কোনো চিতাবাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, এরকম ইচ্ছা ছিল না। তাই হাঁটার বেগটা বেশ একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি চৌদ্দ পনের বছরের পাহাড়ী মেয়ে নেমে আসছে সামনের ঐ পায়ে চলা ঢালু পথ বেয়ে। তার পিঠে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছে একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধা. বোধহয় তার দৃষ্টিও নেই। আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে বনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। তারা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। কিশোরী মেয়েটি একটিবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। দুটি কৌতূহল ভরা কালো হরিণ-চোখ। সুশ্রী মুখখানি ঘিরে কেমন একটা বিষণ্ণ ম্লানিমা। আমারও কৌতূহল হল। আর একটু উঠে গিয়ে রাস্তার বাঁকে দাঁড়ালাম। ওরা নেমে গিয়ে যেখানে থামল, তার ঠিক সামনেই একটি পল্লব-ঘন বটের চারা। গোড়ায় বাঁধানো মাটির বেদি, যত্ন করে নিকানো। সঙ্গিনীকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল কিশোরী। আঁচলের বাঁধন খুলে বের করল দুটি ছোট ছোট মোমবাতি আর একটি দেশলাই। বাতি দুটো জেবলে পাশাপাশি বসিয়ে দিল বেদির উপর। তার-পর একটুখানি পিছনে সরে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, জানি না কার উদ্দেশে। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধা কি বলে উঠল তার পাহাড়ী ভাষায়। বোধহয় কোনো প্রশ্ন। কিন্তু কিশোরীর কাছ থেকে কোনো জবাব এল না। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি করে আবার ওরা ফিরে চলল সন্ধ্যার ছায়াঢাকা চড়াই পথ ধরে। যাবার সময় আর একটা চকিত দৃষ্টি দিয়ে গেল আমার বিস্মিত মুখের উপর।

আমরাও চলতে শুরু করলাম। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নিঃশ্বাসের শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। 'ঠিক ওর মায়ের মত দেখতে হয়েছে মেয়েটা'—স্নিগ্ধ কণ্ঠে যেন আপন মনে বলে উঠল চাপরাশী।

—তুমি চেন নাকি ওদের ?

—চিনি বৈকি। ঐ তো ওদের ঘর। মংখিয়ার মা আর মেয়ে।

মংখিয়া! চমকে উঠলাম। নামটা যেন তড়িৎশিখার মত জ্বলে উঠল আমার স্মৃতির অন্ধকারে। প্রশ্ন করলাম, 'কোন্ মংখিয়া ? মংখিয়া জং ?'

—হ্যাঁ, বাবু। আপনি জানলেন কি করে ?

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের কৃষ্ণাবরণ ভেদ করে আমার

চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানা মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ। তার উপর দুটি ভাসাভাসা অসহায় চোখ। মংখিয়া জং।

মংখিয়ার সঙ্গে দেখা আমার চিটাগং জেলে। চৌদ্দ বছর! হ্যাঁ; তা হ'ল বৈকি। এই গাঁয়ের কথাই সে বলেছিল। পাহাড় কেটে কেটে অতি যত্নে তৈরি ছোট ছোট ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে যে চড়াই পথ সেইখানে তার বাড়ি। ছোট্ট সংসার। বিধবা মা, সতের বছরের বৌ আর তার কোলে একটি বছর খানেকের মেয়ে। ভোর হতেই সে বেরিয়ে যেত "ঝুম্"এ। দু-তিনখানা গ্রাম ছাড়িয়ে দূর পাহাড়ের কোলে। প্রায় একবেলার পথ। বেশীর ভাগ দিনই একা। ঘরের কাজ সেরে মেয়েকে শ্বাশুড়ীর কাছে গছিয়ে কোনো কোনো দিন সিম্‌কিও তার সঙ্গ নেয়। সেদিনটা সে আসতে পারেনি। মংখিয়া একটা গোটা ভুট্টাক্ষেতের জঙ্গল সাফ করে ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল খানিকক্ষণ। হাতে ছিল একটি নধর কচি ভুট্টার মোচা। ছাড়িয়ে মুখে তুলতে যাবে, পাহাড়ের বাঁকের আড়াল থেকে ভেসে এল সুরের ঝঙ্কার। এ সুর তার চেনা। শুধু চেনা নয়, এর সঙ্গে ছিল তার প্রাণের টান। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, সকাল থেকে সকল কাজের মধ্যে এরই পানে পড়েছিল তার কান, এরই জন্যে মন ছিল তার উন্মুখ। জনহীন বনভূমি। তার উপর লুটিয়ে পড়ছে গানের ঢেউ। কখনো কাছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে পাহাড়ের গায়। বেলা বেড়ে চলেছে। গাছের মাথায় ঝলমল করছে রোদ। ঘরে ফিরবার সময় হল। সে খেয়াল নেই মংখিয়ার। আবেশে বুজে আসছে চোখ দুটো। হঠাৎ মনে হল গান তো আর শোনা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মংখিয়া। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এগিয়ে গেল। দু-তিনখানা ভুট্টাক্ষেত পার হয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একটি ঝোপের আড়ালে।

'ওখানে লুকিয়ে কি হচ্ছে, শুনি ?'

ধরা পড়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল মংখিয়া। তার সঙ্গে মিলিত হ'ল কলহাস্যের কোমল ঝঙ্কার।

—সিম্‌কি আসেনি কেন ? প্রশ্ন করল নারীকণ্ঠ।

—এসেছে বৈকি। ঐ তো রয়েছে ওখানে—মংখিয়ার মুখে রহস্যের হাসি।

—ঈস্! তাহলে আর এত সাহস হত না।

—কেন। ভয় কিসের?

—থাক্; আর বাহাদুরি দেখিয়ে কাজ নেই। এবার বাড়ি যাও। বেলা হয়েছে।

—বাড়িই তো যাচ্ছিলাম। এমন সময়—

—কী হ'ল এমন সময়?—মাথাটা বাঁদিকে হেলিয়ে মোহিনী ভঙ্গীতে তাকাল মেয়েটি।

—কিছু না। এই নাও।

মংখিয়া হাত বাড়িয়ে ভুট্টাটা এগিয়ে ধরল।

মেয়েটি হাত বাড়াল না, এগিয়েও গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই বলল, 'কী ওটা?'

—বাঃ। গান শোনালে। বখ্‌শিশ নেবে না?

—চাই না অমন বখশিশ—সমস্ত দেহে একটা দোলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

—না, সত্যি। তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

—ছুঁড়ে দাও ওখান থেকে।

—হাত থেকে নেবে না বুঝি?

—বাঃ। কেউ দেখে ফেলে যদি?

—কেউ নেই এখানে।

—ঐ দ্যাখ, দেখছে—বলে আঙুল তুলে ধরল গাছের দিকে। একটা কাঠবেড়ালী ল্যাজ নাড়ছিল, আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল বিজ্ঞের মত।

দুজনেই হেসে উঠল। মংখিয়া আর একটু কাছে এসে ভুট্টার মোচা তুলে দিল মেয়েটির হাতে।

—দাঁড়াও; আমি একা খাব বুঝি?—বলে মোচাটা ভেঙে আর্ধেকটা সে ফিরিয়ে দিল মংখিয়ার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মিলিত হাসির উচ্ছ্বাস। কিন্তু উঠতে না উঠতেই সে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। মেয়েটির হাত থেকে খসে পড়ে গেল ভুট্টার ভগ্নাংশ। দুজনের মিলিত ভীত দৃষ্টি ঝোপের আড়ালে গিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিম্‌কি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। দিদির একান্ত কাছটিতে এসে তার

চোখের উপর চোখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ছুঁয়ে দিলি!' কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়, তার সঙ্গে অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগ। দিদির কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না। মাথাটা শুধু নুয়ে পড়ল বুকের উপর। দাঁড়িয়ে রইল নিষ্প্রাণ পুতুলের মত।

এবার স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল সিম্‌কি। নির্বাক চাহনি। কিন্তু তার ভিতর থেকে নির্গত হ'ল যে অগ্নিময়ী ভাষা মংখিয়ার কাছে সেটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয়। হঠাৎ দেহময় দীপ্ত তরঙ্গ তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। দৃঢ় হস্তে কোমরে জড়িয়ে নিল আঁচলখানা। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।

'সিম্‌কি, শোন'—এতক্ষণে স্বর ফুটল দিদির কণ্ঠে। কিন্তু শোনবার জন্যে সিম্‌কি আর তখন দাঁড়িয়ে নেই। 'কী হবে?'—শুষ্ককণ্ঠে বলল মংখিয়ার দিকে ফিরে। চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। মংখিয়া নিরুত্তর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর হাতে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে ধীরে ধীরে রওনা হ'ল বাড়ির পথে।

প্রাচীনপন্থী হিন্দু-সমাজে যেমন ভাদ্রবৌ, মংখিয়াদের পাহাড়ী-সমাজে তেমন বৌএর বড় বোন। স্পর্শ করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, মহাপাপ। হিন্দু-সমাজে তার ক্ষমা আছে। কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধানও বোধহয় আছে কোনো রকম। কিন্তু মংখিয়ার সমাজ এখানে ক্ষমা-লেশহীন, নির্মম। এই জাতীয় অপরাধের প্রাথমিক বিচার বরবেন গ্রামের মোড়ল। তিনি যদি তুষ্ট না হন, কিংবা তার বিচারের পরেও যদি গ্রাম্য-সমাজ রুষ্ট থেকে যায়, তখন অপরাধীর তলব পড়বে মহাপরাক্রান্ত মঙ্‌রাজার দরবারে। মঙ্‌রাজা! ইংরেজরা বলতেন বোহ্‌মঙ্ চীফ্ (Bohınong Chief)। তিনিই ছিলেন চিটাগঙ্ হিল ট্রাকট্‌সের দালাই লামা। সমস্ত প্রজাকুলের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। বিস্তৃত তাঁর এক্তিয়ার। ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত অপরাধ শুধু নয়, খুন জখম, চুরি ডাকাতি, ইত্যাদি গুরুতর ক্রাইম্‌ও ছিল তার অলিখিত এলাকার অন্তর্গত। দুদিন তিনদিনের পথ থেকে ব্রিটিশ সরকারের থানা পুলিস এসব ঘটনার সন্ধান পেত না, পেলেও অনেক সময় চুপ করে থাকত।

বাড়ির কাছে আসতেই মংখিয়ার কানে গেল তার শিশুকন্যার কান্না। ছুটে এসে দেখল কেঁদে কেঁদে নীল হয়ে গেছে মেয়েটা। কেউ কোথাও নেই।

মা তথাগত-শিষ্যা। সংসারে থেকেও নেই। গ্রামোপান্তের ক্যাঙ্ থেকে এখনো তার ফিরবার সময় হয়নি। কিন্তু সিম্‌কি? এতক্ষণে সে বোধহয় মোড়লের বাড়ি গিয়ে দশখানা করে লাগাচ্ছে তার নামে। মেয়েটা বাঁচল কি মরল, সে প্রশ্ন আজ তার কাছে অতি তুচ্ছ। অস্নাত, অভুক্ত, পরিশ্রান্ত মংখিয়ার মাথার ভিতরটায় অগ্নি-বৃষ্টি হতে লাগল।

তার অনুমান যে মিথ্যা নয়, জানা গেল একটু পরেই। বাড়ির বাইরে থেকে হাঁক দিল কর্কশ কণ্ঠ—'মংখিয়া আছিস?' মোড়লের চাকর। কিন্তু নিজেকে সে ছোটখাট মোড়ল বলেই জানে, জাহিরও করে সেই রকম। একটা কড়া জবাব এসে গিয়েছিল মংখিয়ার মুখে। সামলে নিয়ে বেরিয়ে এল। খাড়া তলব। অমান্য করলে রক্ষা নেই। বিলম্ব করলেও বিপদ অনিবার্য।

বারান্দায় বসে তামাক টানছিল মোড়ল। তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে সিম্‌কি। কোমর জড়িয়ে তেমনি শক্ত করে বাঁধা আঁচলের বেড়। ফুলো ফুলো চোখ দুটিতে সদ্য-ক্ষান্ত বর্ষণের চিহ্ন। উন্নত বুকে অদম্য উত্তেজনার স্পন্দন। মংখিয়া এসে যখন দাঁড়াল ও পাশটিতে, একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

—বৌ যা বলছে, সত্যি?—প্রশ্ন করল মোড়ল।

—হ্যাঁ; আমি ছুঁয়েছি ওর দিদিকে।

হুঁকা থেকে মুখ তুলে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মোড়ল। তারপর বলল, বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে, 'বলিস কি! ও হল তোর বড় শালী, গুরুজন। ওর পেছনে ঘুরে মরছিস কেন? ছুঁয়েই বা দিলি কোন্ আক্কেলে? এত বড় পাপ তো আর নেই!'

মংখিয়া নিরুত্তর। কয়েক মিনিট থেমে আবার বলল মোড়ল, 'তাছাড়া ও মেয়েটা যে এক নম্বর নচ্ছার, সে তো আর কারো জানতে বাকি নেই। তা না হলে ওর মরদটাই বা ওকে ছেড়ে চলে যাবে কেন?'

এবার উত্তর দিল মংখিয়া, 'ছেড়ে যায়নি; রাঙামাটি গেছে চাকরি করতে।'

—চাকরি করতে, না আমার কপালে আগুন দিতে, অবরুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠল সিম্‌কি।

হাত দিয়ে তাকে থামবার ইঙ্গিত করে মোড়ল বলল, 'যাক্', যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার শুদ্ধ হতে হলে মাথা মুড়োতে হবে, ক্যাঙে বাতি

দিতে হবে বারো গণ্ডা, তারপর সমাজ-খাওয়ানো আছে। সেও অনেক টাকার ব্যাপার।'

সিম্‌কির দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ঘরে যাও, বৌ। মাগীটাকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা আমি করছি। মাথা মুড়ে, লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে—'

'না'—দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিল মংখিয়া। 'ওর কোনো দোষ নেই, দোষ আমার। ওর গায়ে যদি কেউ হাত তোলে, আমি তাকে ছেড়ে দেবো না।'

'বটে!'—বিস্মিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মোড়ল। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'বেশ। গায়ের জোরটা তাহলে মঙ্‌রাজার কাছে গিয়েই দেখিয়ো।'

পরদিন থেকে আবার যথারীতি কাজে লেগে গেল মংখিয়া। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ে কাস্তে নিয়ে। নিজের ক্ষেতে যেদিন কাজ থাকে না, জন খাটে অন্যের জমিতে। বেলা গড়িয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসে। নিঃশব্দে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার কোথায় চলে যায়। মার সঙ্গে যোগাযোগ কোনোকালেই নেই। মেয়েটাকে আদর করত মাঝে মাঝে। তাও ছেড়ে দিয়েছে। বৌএর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে অনেক রাতে যখন ঘরে ফেরে, তার আগেই মেয়ে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সিম্‌কি। ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভাত দুটো খেয়ে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে শুয়ে সেও কখন ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে, বৌ বিছানায় নেই।

এমনি একটা রৌদ্রদগ্ধ দিন। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে পড়েছে অপরাহ্নের কোলে। মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল মংখিয়া। ক্লান্ত, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত। বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে দুজন বিদেশী, কোমরে তকমা আঁটা। মানুষ নয়, যমদূত। মঙ্‌রাজার পাইক। এক নিমেষেই চেনা গেল তাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং সম্বর্ধনার বহর দেখে। কোনোরকমে দুটো ভাত মুখে দিয়ে নেবার সময় চেয়েছিল মংখিয়া, ওরা তো হেসেই খুন। সকাল থেকে বসে বসে এই যে এতখানি সময় নষ্ট হল তাদের, সেটা একবার ভাবল না লোকটা। তারপর আবার ভাত খাবার সময় চাইছে!

ঘরে ঢোকা হল না। দোরগোড়া থেকেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কিছু-দূর এগোতেই চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোড়ল, আর তার খানিকটা পেছনে গাছের আড়ালে পাওয়া গেল সিম্‌কির শাড়ির আভাস। মংখিয়ার চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু সে জ্বালা সে লুকিয়ে

রাখল নিজের কাছেই। একটিবার তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল চোখদুটো।

মহাপ্রতাপান্বিত মঙ্রাজার দরবার। তার চারদিক ঘিরে রয়েছে মধ্য-যুগের নির্মম কঠোরতা। রাজকীয় জাঁকজমকের মাঝখানে বিচার-আসনে বসে এজলাস করছেন বোহ্মঙ চীফ। দুর্জ্ঞেয় তাঁর আইনকানুন, দুর্লঙ্ঘ তাঁর বিধিনিষেধ। সে-সব যে ভঙ্গ করে, অমোঘ দণ্ডের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। দণ্ড মানেই দৈহিক নিপীড়ন। অপরাধ ভেদে তার অমানুষিক বৈচিত্র্য। শুনেছি, কত হতভাগ্য আসামী ঘর থেকে দরবারে এসেছে, আর ঘরে ফিরে যায়নি।

মংখিয়ার অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, আর দেহটাও ছিল পাথরের তৈরি। সেটাকে টেনে নিয়ে কোনোরকমে একদিন সে ঘরে গিয়ে পেঁছল। কেমন করে, আর কিসের জোরে, সে রহস্য সে নিজেও ভেদ করতে পারেনি। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ক্যাঙ্ থেকে ফিরে, বারান্দার উপর একটা অসাড় দেহ পড়ে থাকতে দেখে মা চমকে উঠেছিলেন। শুধু গোঙানি শুনে বুঝেছিলেন তার ছেলে ফিরে এসেছে মঙ্রাজার দরবার থেকে। খানিকটা সুস্থ হবার পর ছেলেকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বলেছিলেন, 'বৌ বাড়ি নেই। মোড়লের ওখানে গেছে বোধহয়। দাঁড়া, ডেকে নিয়ে আসি।'

'না'—শ্রান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল মংখিয়া। সে স্বর শুনে মা-ও আর যেতে সাহস করেননি। পরদিন ছেলের পিঠে তেল মালিস করতে করতে অনেকটা যেন কৈফিয়তেব সুরে বললেন মা, 'ছেলেমানুষ। ঝোঁকের মাথায় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এখন ভয়ে আসছে না।'

মংখিয়ার কাছ থেকে ভাল মন্দ কোনো জবাব পাওয়া গেল না। একটু থেমে সুর চড়িয়ে বললেন মা, 'তাই বলে ঘরের বৌ পরের বাড়ি পড়ে থাকবে নাকি? বাড়ি আনতে হবে না?' মংখিয়া এবারেও নিরুত্তর।

তার পর দিন। রাত শেষ না হতেই মা চলে গেছেন মন্দিরে। মংখিয়াও কাটারি হাতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল মাঠের পথে। খানিকদূর গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে এল। কিন্তু বাড়ি ঢুকল না। তেমনি মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল মোড়লের বাড়ির দিকে। মোড়ল নেই। পুরো ঝুমের সময়। সেই রাত থাকতে বেরিয়ে গেছে পাহাড়ে। তার বৌ আর দুটো ছেলেও গেছে খানিক পর। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই। মংখিয়া এগিয়ে চলল। ভিতর দিকের উঠানে ঘরের কোলে ছায়ায় বসে মেয়েকে স্তন দিচ্ছিল সিম্কি।

নিঃশব্দ চরণে সামনে এসে দাঁড়াল মংখিয়া। সিম্‌কির দৃষ্টি ছিল মেয়ের মুখে। প্রথমটা কিছু জানতে পারেনি। হঠাৎ ছায়া দেখে চমকে উঠল। চকিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি দেখল সেই জানে। পালাতে গিয়েও পালাল না। যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। শুধু অনাবৃত বুকের উপর আলগোছে টেনে দিল স্খলিত আঁচলখানা। মংখিয়া দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত। নিজের স্বল্পাবৃত দেহের উপর সেই একাগ্র দৃষ্টি অনুভব করে সিম্‌কির ভীরু চোখে ফুটে উঠল লাজরক্ত মৃদুহাসি। স্নিগ্ধ তিরস্কারের সুরে বলল, 'অসভ্য কোথাকার!' তারপর মেয়ের মুখ থেকে স্তনাগ্র সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আর খেতে হ'বে না। ঐ দ্যাখ্‌ কে এসেছে।' মেয়ে হাসল। দন্তহীন অন্তরঙ্গ হাসি। মংখিয়া নত হয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিল। একটিবার তার কোমল কচি গালদুটো ধরে আদর করল। তারপর তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, দুপা এগিয়ে এসে বৌ-এর গলায় বসিয়ে দিল কাটারির ঘা। মাথাটা যখন ছিটকে পড়ল মাটিতে, সেই শেষ স্নিগ্ধ হাসিটি বোধহয় তখনো তার চোখের কোণে মিলিয়ে যায়নি।

সংক্ষেপে এই হল মংখিয়া জং-এর খুনের ইতিহাস। শুনেছিলাম তার মুখ থেকেই চিটাগং জেলের বারো নম্বর সেল-এর সামনে বসে। গুছিয়ে সাজিয়ে বলা আত্ম-কাহিনী নয়। প্রশ্নের জাল ফেলে সংগ্রহ করা তথ্য। দোভাষী ছিল আমার অফিস-রাইটার (writer) গুণধর চাক্‌মা। বক্তার ভাষাকে ভাষান্তরে পৌঁছে দেওয়াই হল দোভাষীর কাজ। সে শুধু কাঠামো; তার মধ্যে সমুর্ত প্রাণের স্পন্দন কেউ আশা করে না। গুণধরের মুখ থেকে যে-কাহিনী সেদিন শুনেছিলাম, সেটা ভাষান্তর নয়, রূপান্তর—অন্তরের রং দিয়ে আঁকা। সেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণ-নিষ্ঠার পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ছিল দরদী প্রাণের সনিষ্ঠ প্রকাশ। সে যেন অন্যের কথা নয়, দোভাষীর নিজেরই অনুতাপবিদ্ধ অন্তরের বেদনাময় রূপ।

বেশ মনে আছে, শুনতে শুনতে কখন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বাধা দিল একটা অতি পরিচিত 'খটাস' শব্দ। অর্থাৎ বড় জমাদার সবুট-সেলাম ঠুকে নিবেদন করলেন, 'ফাঁসিকা খানা আয়া, হুজুর।' তার পেছনে কালিমাখা 'চৌকাওয়ালার' হাতে ঢাকা-দেওয়া অ্যালুমিনিয়মের

থালা। থালা উদ্‌ঘাটিত হ'ল। দেখলাম। শুধু খানা নয়, এই মৃত্যুপথ-যাত্রীর অন্নের থালার সঙ্গে জড়ানো জেলরক্ষীদের নীরব হৃদয়স্পর্শ।

ভাতের পরিমাণটা বোধহয় দু-'ডাবু', অর্থাৎ সাধারণ কয়েদির যে বরাদ্দ, তার ডবল। সেই অনুপাতে ডাল তরকারি। সেদিনটা ছিল মৎসদিবস, অর্থাৎ সাপ্তাহিক fish day। ভাতের স্তূপের উপর তার যে ভর্জিত খণ্ডটি লক্ষ্য করলাম তার আয়তনও চারজনের বরাদ্দের চেয়ে ছোট নয়। ফাঁসি-আসামীর জন্যে এই যে বিশেষ ব্যবস্থা, এর পেছনে জেল কোডের অনুশাসন নেই, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা অনুমোদন কিছুই নেই। এর মধ্যে যদি কোনো কোড্ থাকে, তার রচয়িতা জেলখানার বহু-নিন্দিত সিপাই জমাদার।

খানা পরিবেশিত হল। সেই সঙ্গে জমাদারের পকেট থেকে বেরোল এক বাণ্ডিল বিড়ি। এ বস্তুটিও খানার অঙ্গ। Condemned prisoner অর্থাৎ ফাঁসির জন্যে অপেক্ষমান বন্দীর সরকার-প্রদত্ত special privilege। অন্য কয়েদিরা এ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত।

ত্রি-সন্ধ্যা এই ফাঁসি-যাত্রীর খাদ্য-পরীক্ষা ছিল আমার আইনবদ্ধ কার্য তালিকার অঙ্গ। ঠিক পরীক্ষা নয়, নিরীক্ষা। কি উদ্দেশ্যে এ আইন রচিত হয়েছিল, আমি জানি না। বোধহয়, যে-হত্যাকাণ্ড সরকারের নিজস্ব অধিকার, তার উপর আর কেউ অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে, তারই জন্যে এই হুঁশিয়ারি।

মংখিয়ার কাহিনীর বাকী অংশটা সংক্ষিপ্ত। সরকারী নথিপত্র থেকেই পাওয়া গেল তার বিবরণ। মঙ্‌রাজাকে অগ্রাহ্য করে রক্তমাখা কাটারি হাতে সে সোজা গিয়ে উঠল ব্রিটিশ-সরকারের থানায়। শান্ত সহজ কণ্ঠে জানাল, 'এই দা দিয়ে বৌকে খুন করে এলাম। তোমাদের যা করবার কর।'

বিচারের সময় নিম্ন বা উচ্চ আদালতে এর বেশি আর বিশেষ কিছুই সে বলেনি। আত্মপক্ষ-সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা তার ছিল না। সরকারী খরচে একজন তরুণ উকিল তার হয়ে লড়েছিলেন। তিনি বারংবার প্রশ্ন করেছিলেন মংখিয়াকে—'এ কথা কি সত্য নয় যে তোমার স্ত্রী ঐ মোড়লের উপপত্নী ছিল এবং ওর সঙ্গেই সে বসবাস করত?'

—না।

—এ কথা কি সত্য নয় যে ঐ মোড়লের উপপত্নী থাকাকালীন অবস্থায় পাশের বাড়ির আর একজন লোকের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ছিল ?

—মিথ্যা কথা।

—এবং সেই কারণে ঐ মোড়লই তাকে খুন করে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে ?

—না; খুন আমি করেছি।

খুনী মামলার বিচার-স্থল দায়রা আদালত এবং তার জন্যে রয়েছেন বিচারবিভাগের লোক, যাকে বলা হয় সেসন জজ। চিটাগং হিল ট্রাক্ট্সের ব্যবস্থা অন্যরকম। সেখানকার দায়রা বিচারের ভার ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের হাতে। তিনিও নিজে থেকে কতগুলো প্রশ্ন করেছিলেন খুনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে। জানতে চেয়েছিলেন, 'কেন খুন করেছ ? বৌ-এর বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ ? কখন, কী অবস্থায়, কোন্ আক্রোশে নিজের বৌ-এর ঘাড়ে বসিয়ে দিলে দা'এর কোপ্ ?'

এসব কথার দুচারটা জবাব দিয়েছিল মংখিয়া। ঠিক কি বলেছিল, তার পরে আর তার মনে নেই।

আপীলের জন্যে মংখিয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। গুণধর চাক্মা একরকম জোর করেই তাকে রাজী করেছিল। তারপর আমার কাছে এসে বলল, 'আপীলটা, স্যার, আপনাকে লিখতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো উকিল নই।' গুণধর বললে, 'সেই জন্যেই তো বলছি। এখানে উকিলের বুদ্ধি চলবে না।'

—তবে কার বুদ্ধি চলবে শুনি ?

—বুদ্ধি নয়, স্যার, চাই শুধু একটুখানি হার্ট—

গুণধরের অনুরোধে কিনা জানি না, আপীল আমিই লিখেছিলাম। আপীল নয়, আবেদন। তার মধ্যে আইন ছিল না। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের কথায় কোথায় অসঙ্গতি, কোথায় অত্যুক্তি, সে সব দেখিয়ে যুক্তি-জাল বিস্তারের চেষ্টাও ছিল না। ছিল শুধু খানিকটা উচ্ছ্বাস।......স্ত্রীর কাছে কী পেয়েছিল মংখিয়া ? প্রেম নয়, প্রীতি নয়, অণুমাত্র আনুগত্য নয়, শুধু লাঞ্ছনা, ঔদ্ধত্য আর অমানুষিক নির্যাতন। কোনো একটা মানুষের অন্তরের সমস্ত কোমলতা নিংড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে নির্মম কঠোর ক্ষিপ্ত করে তুলবার পক্ষে সেগুলো কি যথেষ্ট নয় ? সে যদি সভ্য মানুষ হত, হয়তো ঐ স্ত্রীকে সে

বর্জন করত, ভেঙে দিত বিবাহবন্ধন, কিংবা হয়তো অন্তরে সঞ্চিত বিষাক্ত বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখে তার সঙ্গেই অভিনয় করে যেত সারাজীবন। কিন্তু মংখিয়া সভ্য মানুষ নয়, পাহাড়ে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে বেড়ে-ওঠা প্রকৃতির হাতের মানুষ। 'সভ্যতার কপটতা তাকে স্পর্শ করেনি। আত্ম-সংযমের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনা সে শেখেনি।' তাই তার বুকের ভেতরকার সমস্ত জিঘাংসা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এল ধ্বংসের নগ্ন মূর্তি ধরে। শিক্ষা-সংস্কৃতির মুখোশ পরে আমি আপনি যেখানে শানিয়ে শানিয়ে শুধু বাক্যবাণ প্রয়োগ করতাম, অরণ্য-চারী মুক্ত মানুষ মংখিয়া সেখানে বসিয়ে দিল মৃত্যুর আঘাত।

তারপরে লিখেছিলাম, সভ্য মানুষের জন্যে তৈরি যে আইন সুবিজ্ঞ বিচারক তাই দিয়ে বিচার করেছেন বুনো মানুষের আচরণ। মংখিয়া যে-খুন করেছে, যে-মন নিয়ে খুন করেছে, তাকে দেখতে হবে মংখিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে, তারই দৃষ্টি দিয়ে; শিক্ষা-মার্জিত সামাজিক মানুষের দৃষ্টি দিয়ে নয়। অনুভব করতে হ'বে তার সেই দুর্জয় অভিমান, যার তাড়নায় সে নিজের হাতে বিসর্জন দিয়ে এল তার সদ্য-বিকশিত-যৌবনা স্বর্ণ-প্রতিমা, তার একমাত্র শিশু-সন্তানের জননী।

সিমাকি মরল, কিন্তু শেষ হল না। তার মৃত্যু-দাহের সমস্ত দুঃসহ জ্বালা সে দিয়ে গেল এই নারীহন্তার দেহ মনে। তার কাছে কোথায় লাগে মৃত্যু দণ্ড! ফাঁসি তো তার শাস্তি নয়, শান্তি।

উপসংহারে লিখেছিলাম, মংখিয়ার নিজের জন্যে না হোক, যারা রয়ে গেল তার উপর একান্ত নির্ভর—একটি নিষ্পাপ বৃদ্ধা, আর একটি নিরপরাধ শিশু,—তাদের মুখ চেয়ে এই হতভাগ্য বন্দী শুধু বেঁচে থাকবার করুণাটুকু কামনা করে।

কদিনের মধ্যেই আপীলের ফল বেরিয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এই রকম আবেদনের যেটা যথাযথ উত্তর। অর্থাৎ, Appeal summarily dismissed। সরাসরি না-মঞ্জুর। তার কয়েকদিন পরেই কমিশনার সাহেব এলেন জেল-পরিদর্শনে। এটা সেটা দেখবার পর ঢুকলেন ফাঁসি-ডিগ্রির চত্বরে। মংখিয়ার সেল-এর সামনে দাঁড়িয়ে জেলর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, who wrote his appeal?

—ডেপুটি জেলর মলয় চৌধুরী।

—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

ছুটতে ছুটতে এলেন জেলর সাহেব। বললেন, যাও, তোমার ডাক পড়েছে। তখন বলিনি যে ঐ সব পাগলামো করো না? এ কি তোমার বাংলা মাসিকের প্রবন্ধ যে আবোল তাবোল যা খুশি লিখলেই হয়ে গেল? এবার বোঝো।

সুপারের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন কমিশনার। প্রবীন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান। কাছে যেতেই সাগ্রহে বলে উঠলেন, আপনি লিখেছিলেন আপীল? I congratulate you—বলে, হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। স্ত্রীর আচরণ যতই উত্তেজক হোক, হঠাৎ রুখে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় খুন করেনি মংখিয়া। It was a planned affair. ভেবে চিন্তে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই সে গিয়েছিল মোড়লের বাড়ি।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। সাহেব একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন, তার চেয়ে বড় কথা,—বাই দি বাই, আপনি ম্যাডোনার ছবি দেখেছেন?

বললাম, দেখেছি।

ভাবগভীর সুরে বললেন কমিশনার, আমার বিশ্বাস, ওর চেয়ে সুন্দর, ওর চেয়ে পবিত্র সৃষ্টি সংসারে আর কিছু নেই। আপনার কি মনে হয়?

বললাম, আমার ধারণাও তাই।

সাহেব বললেন, মংখিয়ার চোখের সামনে ছিল সেই জীবন্ত ম্যাডোনা—A young mother suckling her little baby. যে-কোনো একটা নারী-মূর্তি নয়, তারই সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, আর তার কোলে শুয়ে স্তন-পান করছিল যে শিশু, সেও তারই প্রথম সন্তান। Can you imagine a purer sight! But it could not soften his mind. এতটুকু দাগ পড়ল না তার মনের ওপর। What a hardened criminal! আপনি বলছেন সে করুণার পাত্র! Absurd. He deserves no mercy. মৃত্যুই তার উপযুক্ত দন্ড।

কমিশনার সাহেবের যুক্তি খন্ডন করবার মত কোনো তথ্য আমার হাতে ছিল না। তাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করেই ছিলাম। হয়তো ওঁর কথাই ঠিক। এই খুনী লোকটাকে আমি যা দেখাতে চেয়েছি, সেটা সে নয়। মানুষের অন্তরের কাছে তার কোনো দাবি নেই। তবু, পরদিন সকাল বেলা আবার

যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তার সেল্-এর সামনে, আর সে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে,—তার বিশাল দেহের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান ভীরু, ভাবলেশ বর্জিত ছোট ছোট দুটি চোখ,—আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে।

ফাঁসির দিন ধার্য হ'ল। তার কদিন আগে যথারীতি জিজ্ঞাসা করা হ'ল আসামীকে, কাউকে দেখতে চাও?

মংখিয়া বলল, অনেক দ্বিধা সঙ্কোচের পর, আমার মাকে যদি একবার—। সরকারী ব্যবস্থায় পাঁচ-ছ-দিনের মধ্যেই তার মাকে নিয়ে আসা হল। সেই শীর্ণকায়া পার্বত্যরমণীর দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলাম বার্দ্ধক্য তার দেহকে নুইয়ে দিলেও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে দেখে একথা মনে হলনা যে, তার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র এবং সংসারের একমাত্র অবলম্বন আজ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করেছে। জেল গেট থেকে দুর্বল কিন্তু অবিচল পদক্ষেপে সেল-চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ফাঁসি-ডিগ্রির লৌহ কপাট খুলে দেওয়া হ'ল। ফাঁসির আসামী ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। কাছে গিয়ে বললাম, বাইরে এসো। তোমার মা এসেছেন।

অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নেমে এল মংখিয়া। নত হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরতে গেল তার মায়ের পা দুটো। চোখের নিমেষে দুহাত ছিটকে পিছিয়ে গেলেন মা। হাত নেড়ে নিষেধের সুরে কি যেন বলে উঠলেন ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ন পাহাড়ী ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দোভাষী চাকমার গম্ভীর কণ্ঠ—Don't touch me; you are a sinner. পরমুহূর্তেই কেমন কোমল হয়ে গেল বৃদ্ধার জড়িত স্বর। ডান হাতখানা উপরে তুলে বিড়বিড় করে বললেন, তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

মংখিয়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল সদ্য-তিরস্কৃত শিশুর মত। দুচোখের কোণ বেয়ে নেমে এল জলধারা। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কজন মানুষ—জীবন্ত নয়, চিত্রার্পিত। তাদের সচকিত করে আবার শোনা গেল বৃদ্ধার সুস্পষ্ট তীক্ষ্ন স্বর—কী চাও তুমি আমার কাছে?

মংখিয়া চোখ তুলে তাকাল। ভগ্নকণ্ঠে বলল, চাইবার আমার কারো কাছেই কিছু নেই, মা। সেজন্য তোমায় ডাকিনি। একটা কথা শুধু বলে যাবো। তাই তোমায় কষ্ট দিয়েছি।

মা অপেক্ষা করে রইলেন। ক্ষণিক বিরতির পর আবার শুরু করল মংখিয়া, আমি যখন আর থাকবো না, আমাদের বাড়ির সাম্‌নে যে জমিটুকু আছে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকত, ঝুম্‌ থেকে ফিরতে যেদিন দেরি হ'ত আমার, সেইখানে, ঠিক সেই জায়গাটিতে একটা বটের চারা লাগিয়ে দিও। দেখো, জল দিতে যেন ভুল না হয়। তারপর গাছ যেদিন পাতা মেলতে শুরু করবে, একটু মাটি দিয়ে গোড়াটা বাঁধিয়ে দিও। রোজ সন্ধ্যা বেলা তার নাম করে একটা করে বাতি জেবলে দিও সেই বেদির ওপর। মেয়েটা যদি বাঁচে, একটু বড় হ'লে, তারই হাতে ছেড়ে দিও এ কাজের ভার। বলো, এটা তার বাবার শেষ ইচ্ছা।

মা, (চমকে উঠলাম তার সেই ডাক শুনে) এইটুকু, শুধু এই কাজটুকু আমার জন্যে তোমরা পারবে না ?

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মংখিয়ার। চোখ দুটো দুহাতে চেপে ধরে ছুটে চলে গেল তার নির্দ্দিষ্ট সেল্‌এর মধ্যে।

আরো কিছুক্ষণ তেমনি নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তার মা। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন ফিরে যাবার পথে। হঠাৎ মনে হ'ল পা দুটো তার কেঁপে উঠল! শুধু পা নয় সমস্ত শরীর। গুণধর চাকমা ছুটে এল। তার সঙ্গে একজন ওয়ার্ডার। তাদের প্রসারিত হাতের উপর লুটিয়ে পড়ল তপঃ-ক্ষীণা বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন শীর্ণ দেহ।

॥ সমাপ্ত ॥